



মাসিক  
**আলোকধাৰা**

তাসাওউফ বিষয়ে বহুমুখী গবেষণা ও বিশ্লেষণমূলক জার্নাল

রেজিঃ নং চ-২৭২

২৬তম বৰ্ষ

১০ম সংখ্যা

অক্টোবৰ ২০২০ ইসায়ী

بِلِغْ الْعَسْكَرِ بِحَمَّالِهِ  
كَفَلَ اللَّهُ بِحَمَّالِهِ  
جَنَّتِي سُبْحَانَ رَحْمَانِهِ  
صَلَوَاتُ عَلَيْهِ فِيمَا لَهُ



পরিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (দ.) ও  
মহান ২৬ আশ্বিন উরস শরিফ সংখ্যা

# বিশ্বালি শাহানশাহ হযরত মাওলানা শাহ সুফি সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণৰী (ক.)

বংশ লতিকা

মাইজভাণৰীয়া তুরিকার প্ৰবৰ্তক গাউসুল আয়ম মাইজভাণৰী  
খাদেমুল অলদ হযরত মাওলানা শাহ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (ক.)  
[১৮২৬-১৯০৬]

পুত্ৰ

বেলায়তে মাআব হযরত মাওলানা শাহ সুফি  
সৈয়দ ফয়জুল হক ফানা-ই ওয়াসেল মাইজভাণৰী (ক.)  
[১৮৬৫-১৯০২]

পুত্ৰ

অছিয়ে গাউসুল আয়ম খাদেমুল ফোকারা হযরত মাওলানা শাহ সুফি  
সৈয়দ দেলাওৱ হোসাইন মাইজভাণৰী (ক.)  
[১৮৯৩-১৯৮২]

১ম পুত্ৰ

বিশ্বালি শাহানশাহ হযরত মাওলানা শাহ সুফি  
সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণৰী (ক.)  
[১৯২৮-১৯৮৮]

একমাত্ৰ পুত্ৰ

রাহবাৱে আলম হযরত মাওলানা শাহ সুফি  
সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণৰী (ম.)

সাজ্জাদানশীন, গাউসিয়া হক মন্ডিল, দৱবাৱে গাউসুল আয়ম মাইজভাণৰী  
ম্যানেজিং ট্ৰাস্ট, শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণৰী (কং) ট্ৰাস্ট

# মাসিক আলোকধারা

THE ALOKDHARA  
A MONTHLY JOURNAL OF  
TASAWWUF STUDIES

রেজি. নং চ ২৭২, ২৬তম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা

অক্টোবর ২০২০ ঈসায়ী

সফর-রবিউল আউয়াল ১৪৪২ হিজরী

আশ্বিন-কার্তিক ১৪২৭ বাংলা

## প্রকাশক

গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর পবিত্র রক্ত ও  
ত্বরিকতের উত্তরাধিকার সূত্রে এবং অছিয়ে গাউসুল  
আযম মাইজভাণ্ডারী প্রদত্ত দলিলমূলে, গাউসুল  
আযম মাইজভাণ্ডারীর রওজা শরিফের খেদমতের  
হকদার, তাঁর স্মৃতি বিজড়িত অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের  
হকদার, শাহী ময়দান ব্যবস্থাপনার হকদার-  
মাইজভাণ্ডার শরিফ গাউসিয়া হক মন্জিলের  
সাজাদানশীন

সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান

## সম্পাদক

ড. সৈয়দ আবদুল ওয়াজেদ

## যোগাযোগ:

লেখা সংক্রান্ত: ০১৭৫১ ৭৪০১০৬

০১৩১০ ৭৯৩৩৩২

মুদ্রণ ও প্রচার সংক্রান্ত: ০১৮১৯ ৩৮০৮৫০

০১৭১১ ৩৩৫৬৯১

মূল্য : ২০ টাকা \$=2

## সম্পাদকীয় যোগাযোগ:

দি আলোকধারা প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স

সৈয়দ সলিমুল্লাহ শাহ রোড, বিবিরহাট

পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম-৪২১১। ফোন: ০৩১-২৫৫৪৩২৬-৭



এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট-এর পক্ষে  
মাইজভাণ্ডারী একাডেমি প্রকাশনা

Web: www.sufimaizbhandari.org.bd

E-mail: sufialokdhara@gmail.com

## সূচী

□ সম্পাদকীয়	২
□ বেলায়তে মোত্তাকা	
খাদেমুল ফোকারা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.)	
চতুর্থ পরিচ্ছেদ : হ্যরত গাউসুল আযম মাওলানা শাহসুফি	
সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (ক.)	৩
□ বিশ্বনবী হ্যরত মুহাম্মদ (দ.) এর তাসাওউফ ধারা :	
নবুয়ত প্রকাশের পর নির্যাতিত বিশ্বনবী (দ.)	
অধ্যাপক জহুর উল আলম	৬
□ হ্যরত গাউসুল আযম শাহসুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ	
মাইজভাণ্ডারী (ক.) এবং শাহানশাহ হ্যরত সৈয়দ জিয়াউল হক	
মাইজভাণ্ডারীর (ক.) খোদাদাদ বৈশিষ্ট্য: ‘তাইয়ে যমান ও	
তাইয়ে আরদ’ সময় ও স্থানের ব্যবধান সঙ্কোচন]	
মোঃ মাহবুব উল আলম	১০
□ উম্মুল মু'মিনিন হ্যরত হাফসা রাদিয়াল্লাহ তাঁ'আলা আনহা	
মো: গোলাম রসূল	১৪
□ ইদে মিলাদুল্লবী (দ.) উদ্যাপনের সার্থকতা	
মুহাম্মদ ওহীদুল আলম	১৬
□ ইউসুফে সানী বেলাশক বু-দ দর আখের যামা :	
বাবা ভাণ্ডারী কেবলা আলম	
আলোকধারা ডেক্ষ	১৯
□ মানবজীবনে পরিশুল্কি অর্জনে আউলাদে রাসূল (দ.)	
শাহানশাহ সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর জীবনার্দশ	
মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম	২০
□ তাওহীদের সূর্য: মাইজভাণ্ডার শরিফ ও	
বেলায়তে মোত্তাকার উৎস সন্ধানে	
জাবেদ বিন আলম	২৪
□ পবিত্র কোরআন ও হাদিসের আলোকে উত্তরণের উপায় :	
প্রসঙ্গ মহামারী	
মাওলানা এস এম এম সেলিম উল্লাহ	৩০
□ জীবনালেখ্য:	
হ্যরত হাফেজ সিরাজী (র.) এবং	
সত্য আবৃত বন্ধনহীন কাব্যভাষা	
ড. সৈয়দ আবদুল ওয়াজেদ	৩৪
□ নারী জাতির মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ইসলাম	
আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইকবাল	৩৭
□ শিশু-কিশোর মাহফিল	
সত্যবাদিতা: মানুষের অনুপম চারিত্রের একটি শ্রেষ্ঠ গুণ	৩৮
ঝীহি মা ঝীহি (মাওলানা জামীর উপদেশ বাণী)	
অনুবাদক: কাজী মোহাম্মদ সাইফুদ্দিন হোসেন	৪০
□ মাইজভাণ্ডারী দর্শনের আলোকে আত্মশুল্ক ব্যক্তি জীবন ও সমাজ	
মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম	৪২
□ দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ বিনির্মাণে আত্মনির্ভরশীলতার তাৎপর্য	
মোহাম্মদ মিনহাজ উদ্দিন	৪৫
□ পাঠক মতামত:	
উত্তীর্ণমুক্ত সমাজ বিনির্মাণে সুফিবাদের ভূমিকা	
মুহাম্মদ সৌরভ হোসেন	৪৭

## সম্পাদকীয়

মহান আল্লাহতায়ালার অপরিমেয় করুণার প্রতি আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতা। মাসিক আলোকধারার এই সংখ্যায় নতুন ও ধারাবাহিক রচনার বিষয়-বৈচিত্র্য উপস্থাপনে আন্তরিক প্রচেষ্টা রয়েছে।

এই সংখ্যায় এবার বেলায়তে মোত্লাকা গ্রন্থের চতুর্থ পরিচ্ছেদ মহান আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহে বাংলা সাধু বাক-বীতিতে রূপান্তর মুদ্রিত হলো। বিশ্ব সমাজে মাইজভাণ্ডারীয়া তুরিকার লিখিত আকারে স্বরূপ উন্মোচক অঙ্গে গাউসুল আয়ম, সুলতানুল আউলিয়া, খাদেমুল ফোকারা হ্যরত মাওলানা শাহসুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) যে কথাগুলো তাঁর পবিত্র কলমে লিখেছেন - সেই কালামেরই মূল ভাবার্থে বিশ্বস্ত থাকার আন্তরিক প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে এই সারানুবাদে। প্রায় ১৫ অধ্যায়ের এই পবিত্র গ্রন্থটির (পরিশিষ্ট বাদে) মধ্যে তাসাওউফ, তুরিকা ও বেলায়তের যে বিপুল জ্ঞানের সমারোহ ঘটেছে তা বিস্ময়কর। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রন্থটির চতুর্থ অধ্যায় হ্যরত গাউসুল আয়ম হ্যরত মাওলানা শাহসুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (ক.)-এর আবির্ভাব, খাতেমুল অলি হিসাবে তাঁর পবিত্র গাউসিয়ত, বেলায়তি প্রামাণ্য, তাঁর সম্পর্কে হ্যরত মহিউদ্দীন ইবনে আরাবি (র.)-এর বিস্ময়কর বিবরণ, ৫৯৫ হিয়রিতে পরম্পর সাক্ষাৎ, মোহরে বেলায়তের চিহ্ন প্রদর্শন, ফসুসুল হেকমে তাঁর আনুষ্ঠানিক আগমনের আগাম বার্তা সবই যথার্থ সনদের মাধ্যমে বিধৃত হয়েছে। তাই এই অধ্যায়টি গ্রন্থের মধ্যে অত্যধিক তাৎপর্যপূর্ণ।

বিশ্বনবী হ্যরত মুহাম্মদ (দ.)-এর তাসাওউফ ধারা নবুয়ত প্রকাশের পর নির্যাতিত বিশ্বনবী (দ.), শীর্ষক ধারাবাহিক রচনায় সর্বোপরি মহান আল্লাহতায়ালার প্রতি তাঁর সীমাহীন ভালবাসা ও নির্ভরতার পবিত্র দৃষ্টান্তগুলো সুলিখিত ভাষায় তুলে ধরেছেন অধ্যাপক জহুর উল আলম।

নূরে ইলাহীর এক অনন্ত ফোয়ারা, অনন্ত শান্তির এক ‘প্রশান্ত মহাসাগরে’ বিশ্বালি শাহানশাহ হ্যরত মাওলানা শাহসুফি সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) এর ৩২তম পবিত্র উরস শরিফ এবারও যথাযোগ্য মর্যাদায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে ২৬ আশ্বিন ১৪২৭ বাংলা ও ১১ অক্টোবর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ তারিখে। এবারের উরস শরিফ অনুষ্ঠানে ভিন্ন আঙ্গিকে বিভিন্ন আয়োজন থাকছে। পবিত্র দরবারে ও রওজা প্রাঙ্গণে ভক্ত-আশেকান সবাই যিয়ারত, খতমে কোরআন, খতমে গাউসিয়ায় অংশ নিচ্ছেন। এতিমধ্যায় বিতরণ করা হচ্ছে খাবার। এছাড়া শাহানশাহ বাবাজান (ক.) এর চাহরাম শরিফও অনুষ্ঠিত হচ্ছে ২৯ আশ্বিন ১৪ অক্টোবর। এই সংখ্যায় এই মহান অলির প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় ছাপা হলো মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম রচিত ‘মানব জীবনে পরিশুল্কি অর্জনে আউলাদে রাসূল (দ.) শাহানশাহ হ্যরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী’র জীবনাদর্শ’ শীর্ষক লেখাটি। তিনি ছিলেন মানব কুলের কল্যাণের দিশারি, পবিত্র ঝর্ণাধারা। এই মহান অলি সম্পর্কে লেখকের একটি প্রশংসনযোগ্য উক্তি হচ্ছে, অসংখ্য অশুদ্ধ, অপবিত্র মানুষ তাঁর জীবনাদর্শকে অনুসরণ করতঃ পরিশুল্কি মানুষ তথা আশরাফুল মখলুকাত রূপে রূপান্তরিত হচ্ছে প্রতিটি মুহূর্তে।

১৪ অক্টোবর গাউসুল আয়ম বিল ‘বিরাসত হ্যরত মাওলানা শাহসুফি সৈয়দ গোলামুর রহমান বাবা ভাণ্ডারী (ক.) পবিত্র খোশরোজ শরিফ। এই সংখ্যায় তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে পত্রস্থ হলো ‘ইউসুফে সানী বেলাশক বু-দ দর আখের যামা : বাবা

ভাণ্ডারী কেবলা আলম’ মুদ্রিত হলো।

এ সংখ্যায় মোঃ মাহবুব উল আলম ‘হ্যরত গাউসুল আয়ম শাহসুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (ক.) এবং শাহানশাহ হ্যরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) খোদাদাদ বৈশিষ্ট্য / তাইয়ে যমান ও তাইয়ে আরদ্দ (সময় ও স্থানের ব্যবধান সঙ্কোচন)’ শীর্ষক লেখাটি তাসাওউফ জগতের এক গভীর সত্যের অভিপ্রাকাশ। আধুনিক বিজ্ঞানের গতিবিদ্যা, টাইম এন্ড টিপস নিয়ে যে অভিজ্ঞান বর্তমান সময়ে দেশ-বিদেশে অধিত হচ্ছে- তারও বহু আগে নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে এবং অলি-আল্লাহগণের মাধ্যমে আলোকিত মানুষের কাছে বিষয়টি জ্ঞাত ছিলো। এই লেখায় হ্যরত দাউদ (আ.) এবং সুলায়মান (আ.) অতঃপর বিশ্বনী হ্যরত মুহাম্মদ (দ.) হয়ে বেলায়তি ধারায় অন্যান্য দৃষ্টান্তসহ মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফের অলিয়ে-কেরামগণের দ্বারা সংঘটিত খোদায়ী কুদরতের দৃষ্টান্ত হিসাবে বিভিন্ন ঘটনার কথা উপস্থাপিত হয়েছে। সময় ও স্থানের ব্যবধান সঙ্কোচন মহান আল্লাহর ইচ্ছায় নবী ও অলি আল্লাহগণের দ্বারা নানা প্রেক্ষাপটে সংঘটিত হয়েছে। নবীদের ক্ষেত্রে যাকে বলা হয় মোজেজো। আর অলি-আল্লাহগণের ক্ষেত্রে তা কারামত হিসাবে অভিহিত।

এই সংখ্যায় উম্মাহাতুল মোমিনিন হ্যরত হাফসা (রা.)-এর উপর একটি অনবদ্য রচনা মুদ্রিত হলো। মো. গোলাম রসূল এই লেখাটিতে হ্যরত হাফসা (রা.)-এর জীবনাদর্শ, মহানবী (দ.) এর সাথে তাঁর পবিত্র দাম্পত্য জীবনের শিক্ষনীয় পেক্ষাপট তুলে ধরেছেন। মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা, মানুষের প্রতি দানশীলতার উৎকৃষ্টতম দৃষ্টান্তগুলো লেখার নানা পর্যায়ে উদ্ঘাটিত হয়েছে।

মুহাম্মদ ওহীদুল আলম এই সংখ্যায় লিখেছেন ‘দৈদে মিলাদুল্লাহী উদ্যাপনের সার্থকতা’ শীর্ষক একটি বিশ্লেষণধর্মী লেখা। এই রচনায় মহান সৃষ্টার একত্ত প্রচারে মহানবী (দ.)-এর জীবনের নানামাত্রিক কঠিন অভিযাত্রা অনবদ্য বাক-ভঙ্গীতে উপস্থাপিত হয়েছে। মহাপবিত্র, মহাসত্য আল্লাহতায়ালার প্রতি শতহাজীর আনুগত্য, ভালবাসা ও বিশ্বাসের ভেতর মানুষের আত্মার মুক্তির যে প্রতিশ্রূতি তা মহানবী (দ.) তাঁর জীবনাচরণের মধ্য দিয়ে জগতাসীর কাছে উপস্থাপন করে গেছেন। এই অনন্য উচ্চতার নানা মাত্রার উপস্থাপন লেখাটিকে সুপার্য করেছে।

এ সংখ্যায় জাবেদ বিন আলম রচিত ধারাবাহিক রচনা ‘তাওহীদের সূর্য : মাইজভাণ্ডার শরিফ ও বেলায়তে মোত্লাকার উৎস সঞ্চানে, মাওলানা এস এম এম সেলিম উল্লাহ রচিত ‘পবিত্র কোরআন ও হাদিসের আলোকে উত্তরণের উপায় : প্রসঙ্গ মহামারি’ শীর্ষক রচনা, ‘হ্যরত হাফেজ সিরাজী (র.) এবং সত্য আবৃত বন্ধনহীন কাব্যভাষা’ শীর্ষক রচনা, আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইকবাল রচিত ধারাবাহিক রচনা ‘নারী জাতির মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ইসলাম’ কাজী মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ হোসেন অনুদিত ‘ফীহি মা ফীহি’ (মওলানা রূমীর উপদেশ বাণী), মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম রচিত ‘মাইজভাণ্ডারী দর্শনের আলোকে আত্মশুद্ধ ব্যক্তি জীবন ও সমাজ’ মোহাম্মদ মিনহাজ উদ্দিন রচিত ‘দারিদ্র মৃক্ষ সমাজ বিনির্মাণে আত্মনির্ভরশীলতা’র ঐতিহাসিক ও বাস্তবিক কার্যকারিতা’ ইত্যাদি রচনা পাঠকদের বহুমাত্রিক তাসাওউফ বিষয়ক ভাবনাকে সমৃদ্ধ করবে। এছাড়াও যথারীতি রয়েছে এ সংখ্যায় শিশু-কিশোর মাহফিল এর সত্যবাদিতা : মানুষের অনুপম চরিত্রের একটি শ্রেষ্ঠ গুণ’ শীর্ষক রচনা।

## বেলায়তে মোত্লাকা

# খাতেমুল ফোকারা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) চতুর্থ পরিচ্ছেদ

## হ্যরত গাউসুল আযম মাওলানা শাহসুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (ক.)

### আবির্ভাবের পূর্বাভাষ

বড় পীর দন্তগীর হ্যরত শায়খ আবদুল কাদের জিলানী (ক.) গাউসুল আযম এন্টেতাহিয়া (আরঙ্গকারী) মোকাইয়্যাদায়ে মোহাম্মদীর ওফাতের (মহাপ্রয়াণের) পর দীর্ঘ পাঁচশ বছরের বেশি সময় অতিবাহিত হয়ে যায়। সময়ের এই বিশাল দূরত্বের কারণে (এই উপ মহাদেশে) ইসলামী হৃকুমতের (শাসন ব্যবস্থা) পতন ও ব্রিটিশ হৃকুমত প্রতিষ্ঠার ফলে এখানে একজন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন যুগ-সংস্কারক অলি-আল্লাহর প্রয়োজনীয়তা প্রকট হয়ে উঠে। এই যুগ-সংস্কারক বিশ্বালি হ্যরত গাউসুল আযম মাওলানা শাহসুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (ক.) এর শুভ আবির্ভাব সম্বন্ধে (ইলমে মাআরেফ অর্থাৎ পরিচিতি জ্ঞান সম্বন্ধে) হ্যরত মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবি (র.) তাঁর সু-প্রসিদ্ধ ফসুল হেকম নামের গ্রন্থের ফস্সে শীষের শেষ ভাগে বর্ণনা করেছেন: “মানবজাতির মধ্যে হ্যরত শীষ (আ.) এর অনুসারী ও তাঁর ভেদাভেদের (রহস্যাবলীর সামগ্রিক বিশেষ জ্ঞান) ধারক ও বাহক এক ছেলে ভূমিষ্ঠ হবেন। তাঁর পর এ রকম মর্যাদা সম্পন্ন আর কোনো ছেলে জন্মগ্রহণ করবেন না। তিনিই-খাতেমুল অলদ হবেন। হ্যরত শায়খ-উল-আকবর মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবি (র.) এর পরিভাষায় অলদ (আওলাদ) ঐ ব্যক্তিকে বলে যে ব্যক্তি পিতার গুণ রহস্যের হামেল বা বাহক। “আল অলদু সির্রুন লি আবিহি” (ফস্সে শীষ ৯৫ পৃ.)। যে ব্যক্তি পিতার চিন্তাধারাকে নিজের (ব্যক্তিগত) জীবনে ফলপ্রসূ করে তাকেও অলদ বলে (ফস্সে নুহী, তৃতীয় অধ্যায়, ১০১ পৃ.)। যে সন্তান নিজ চিন্তাধারায় পিতার চিন্তাধারাকে ধারণ করে ফলপ্রসূ করে তোলে না তাকে অলদ বলা হয় না। “লা ইয়ালিদু ইল্লা ফাজেরান কফ্ফারা” (সূরা নুহ-২৭)। অর্থাৎ তাদের চিন্তাধারা হ্যরত নুহ (আ.) এর চিন্তাধারার মতো ফলপ্রসূ বা অনুরূপ চিন্তাধারা নয়, বরং তাদের চিন্তাধারার মধ্যে রয়েছে বেহায়াপনা ও কুফরি (ফস্সে নুহী, অধ্যায় ৩, পৃ. ১০৫)। কেনানের চিন্তাধারা হ্যরত নুহ (আ.) এর ফলপ্রসূ চিন্তাধারার

মতো নয় বলে তাকে আহল বা অলদ বলে পবিত্র কোরআন স্বীকার করে নি, বরং “লায়সা মিন আহলিকা” (সূরা নুহ-৪৬)। অর্থাৎ তোমার আহল বা অলদ [নুহ (আ.) এর] নয় বলে পবিত্র কোরআনে উল্লেখ রয়েছে।

হ্যরত সোলেমান ফারসি (র.) পারস্যের অধিবাসী হলেও রসূলে করিম (দ.) তাকে আহল বলে স্বীকার করেছেন। তাই হ্যরত নুহ (আ.) পবিত্র কোরআনের পরিভাষায় বলেছেন: ‘লাতাজার আলাল আরদি মিনাল কাফিরিনা দইয়ারা’ (সূরা নুহ-২৬)। অর্থাৎ জগতের অধিবাসী হিসাবে (নিজেকে) অস্বীকারকারী ও খারাপ কাজে উৎসাহনকারী মিথ্যেককে রাখিও না। যেহেতু তাদের ‘নজরে ফিকরি’ বা চিন্তাধারা ভাল কিছু সৃষ্টি করতে পারে না এবং কামেলের (সিন্ধসন্তা) নজরে তাদের ফিকরি (চিন্তা/মতলব) ফলপ্রসূ (সঠিক) নয়। সুতরাং সত্য ও পবিত্র দৃষ্টিভঙ্গির ধারক ও বাহককে ‘অলদ’ বা আহল বলে এবং এর বিপরীত কাজে যে বিশ্বাসী ও লিঙ্গ তাকে আহল বা অলদ বলা যায় না। এই বিবেচনায় বা দৃষ্টিকোণ থেকে, খাতেমুল অলিই খাতেমুল আওলাদ বা অলদ বলে প্রতিপন্ন হন। যেহেতু ‘তাজকেরা-ই-শায়খ-উল-আকবর (ক.)’ কিতাবে (লেখক- আল্লামা বরকতুল্লাহ ফেরেঙ্গী) ২১ পৃষ্ঠায় ফতুহাতে মক্কীয়া’র ৭৩ অধ্যায়ে বলেন, রসূলুল্লাহ (দ.) এর শ্রেষ্ঠ বিশ্বেষনে বেরাসতি বা উত্তরাধিকারীত্ব হলো খাতেমুল বেলায়ত। এই ‘খতম’ বা শেষ দুই প্রকার। প্রথমতঃ যাঁকে এক নম্বর শ্রেষ্ঠ বলা হয় তিনি হলেন হ্যরত ইসা (আ.)। কারণ তিনি একই সাথে রেসালত ও বেলায়তের যুক্ত-অধিকারী। তিনি সমস্ত বেলায়তের খাতেম এবং কেয়ামতের শেষ নির্দেশন। পৃথিবীর শেষ জমানাতে তিনি ব্যক্ত হবেন (পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে প্রকাশিত হবেন)।

### খাতেমুল অলির দর্শন

“দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ খাতেমুল আওলিয়া হচ্ছেন হ্যরত গাউসুল আযম মাওলানা শাহসুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (ক.)। তিনি বেলায়তে মোকাইয়্যাদায়ে মোহাম্মদী বা শৃঙ্খলিত

বেলায়ত যুগের অবসানকারী বা খাতেম। তিনি বৎশগত ও দেশগত হিসাবে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হয়ে ব্যক্ত বা প্রকাশিত হবেন। হ্যরত মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবি (র.) বলেন, ৫৯৫ হিয়রি সনে আমার সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তাঁর শরীরে মোহরে বেলায়তের চিহ্ন তিনি আমাকে দেখান। সাধারণ লোকেরা তাঁর খোদায়ী রহস্যপূর্ণ বাণী স্বীকার করবে না। যদিও তাঁর খাতেমে বেলায়তের চিহ্ন সাধারণ লোকের চোখের আড়ালে, তথাপি আমার জামানাতেও তিনি বিদ্যমান রয়েছেন।” এই হিসাবে খাতেমুল আওলিয়া ঐ সময় থেকে আওলিয়া, ‘যে সময় হ্যরত আদম (আ.) পানি ও মাটির সাথে সংমিশ্রিত ছিলেন’। (ফসুসুল হেকম পৃ. ৯৩)।

খাতেমুল আওলিয়া হচ্ছেন রসূলুল্লাহ (দ.) এর অলিয়ে ওয়ারেস বা আধ্যাত্মিক উভরাধিকারী। খাতেমুল আওলিয়া হচ্ছেন রসূলুল্লাহ (দ.) এর বিভিন্ন রূপের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম রূপ-(ফসুস-৯৩ পৃ.)। ‘বুজুর্গ হিসাবে তিনিই শ্রেষ্ঠ, কারণ তিনি ‘নিসবতাইনে আদমি’ অর্থাৎ তিনি অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ সকল জমানার (যুগ ও সময়ের) সকল অবস্থাকে বেষ্টনকারী কামালিয়াত (সাধনার পূর্ণাঙ্গতা) বা বুজুর্গির (মাহাত্ম্য) কোনো প্রশংসা তার বুজুর্গীতে (আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্যে) বাদ পড়ে না। যদিও তাঁর এই গুণাবলী সাধারণ মানুষের বাহ্যিক দৃষ্টিতে বোধগম্য নাও হতে পারে, সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে বা প্রচলিত বাহ্যিক নিয়মের আলোকে ভাল কিংবা মন্দ হিসাবে প্রতীয়মান হতে পারে। এই সর্বকাল বেষ্টনকারী বেলায়ত ‘আল্লাহ’ নাম বিশিষ্ট বা যুক্ত নামধারী অলি-আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। (ফসুসুল হেকম, পৃ. ১১১)

বেলায়তে খিজরী’র নিরিখে তিনি ফরদুল আফরাদ (অদ্বিতীয়গণের মধ্যে স্বতন্ত্র) ‘জামে উত্তনজিহ ওয়াত্তশবীহ’ অর্থাৎ সূক্ষ্মত ও স্তুলত্বের (দৃশ্য ও অদৃশ্য) সমাবেশকারী (মোতালেবে রশিদী, পৃ. ২৬৮)। এর উপর বেলায়তের আর কোনো দরজা নেই। খাতেমুল আওলিয়া হলো ‘ইসলামী ইমারত বা দেয়ালের শেষ ইট বা গাঁথুনি। যার দ্বারা ইসলাম পূর্ণতাপ্রাপ্ত হবে (ফসুসুল হেকম, পৃ. ৯২)। এতে প্রমাণিত হচ্ছে যে, এই খাতেমে বেলায়তে মোকাইয়্যাদায়ে মোহাম্মদীই হচ্ছেন খাতেমুল অলদ বা আওলাদ। যেহেতু এই ব্যক্তির ব্যক্তিত্বে সর্বোচ্চ বেলায়তি মর্যাদা বা যোগ্যতার সমাবেশ ঘটেছে, বা বলা যায় প্রকাশিত (ব্যক্ত) হয়েছে, যার ফলে এই ‘এন্তেহকাকে অজুনি’ বা ব্যক্তিত্ব প্রকাশিত (ব্যক্ত) হওয়ার জন্য আর কিছু অবশিষ্ট নেই। কাজেই তিনি খাতেমুল অলদ বা শেষ আওলাদ। ফসুসুল হেকম গ্রন্থে আরো কিছু ভবিষ্যদ্বাণী খাতেমুল অলদ বা

আওলাদ সম্পর্কে করা হয়েছে। দেখা যাবে এসব ভবিষ্যদ্বাণী হ্যরত গাউসুল আয়ম মাওলানা শাহসুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (ক.) এর ক্ষেত্রে পরিপূর্ণভাবে প্রযোজ্য হচ্ছে। ফসুসুল হেকম গ্রন্থে বলা হচ্ছে : “এই ছেলের অব্যবহিত আগে তাঁর এক বোন জন্মাই হবে। তাঁর জন্ম চীন প্রান্তে হবে। তাঁর ভাষা সেই নগরের ভাষা হবে। অতঃপর নর-নারীর মধ্যে বন্ধ্যা রোগ সংক্রমিত হবে। জনন-প্রজনন ব্যতীতই বিবাহের আধিক্য হবে। মানবজাতিকে তিনি আল্লাহর দিকে আহ্বান করবেন। কিন্তু সন্তোষজনক সাড়া পাওয়া যাবে না। তাঁর ও সেই যুগের মোমেনদের তিরোধানের পর মানব-স্বভাব চতুর্স্পদ জন্মের স্বভাবে পরিণত হবে। মানুষেরা হালাল-হারাম বাছ বিচার করবে না। ধর্ম ও বিবেকের বিবেচনা থেকে দূরে সরে মানুষ প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির নির্দেশে (তাড়নায়) কামস্পৃহা চরিতার্থ করার কাজে মগ্ন থাকবে।”

উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী হ্যরত আকদাস (ক.) এর প্রতিই প্রযোজ্য হয়। কারণ :

১. হ্যরত মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবির (র.) বর্ণনা অনুসারে হ্যরত শীষ (আ.) আহমদিয়ুল মসরবের নবী, হ্যরত আকদাস হ্যরত গাউসুল আয়ম মাওলানা শাহসুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (ক.) ও আহমদিয়ুল মসরবের চলনভঙ্গী অলি ছিলেন। (যা আগে নবীয়ে সালাসা নিবন্ধে আলোচিত হয়েছে)।
২. তাঁর আগে তাঁর এক বোনের জন্ম হয়।
৩. তাঁর ভাষা স্থানীয় ভাষা ছিলো।
৪. তাঁর যুগে জন্ম-নিয়ন্ত্রণ ও বন্ধ্যাকরণ পদ্ধতি পৃথিবীতে প্রচলিত হয়।
৫. তিনি মানবজাতিকে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে আল্লাহপাকের সুষ্ঠু সঠিক সরল সহজ তুরিকত ও রূহানিয়তের দিকে আহ্বান জানিয়েছেন।
৬. জগদ্বাসী হ্যরত আকদাসের আহ্বানে ব্যাপক ও সন্তোষজনকভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেনি এবং সাড়া দিতেও সক্ষম হয়নি।
৭. তাঁর পর পৃথিবীবাসী (জগদ্বাসী) ব্যাপকভাবে ধর্ম ও বিবেক রহিত হয়ে পশু-প্রাণী জগতের মতো জীবন যাপন করতে দ্বিধাবোধ করছে না, বরং ধর্ম বিবর্জিত জীবন ধারা নীতি হিসাবে গ্রহণ করছে; যা ন্যায়নীতি, সাম্য ও দয়া বহির্ভূত।
৮. চট্টগ্রামকে চীনপ্রান্ত বলা হয়েছে। এটি এ কারণে যে, হ্যরত মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবি (র.) এর যুগে এই

অঞ্চলে চীনা বংশধরদের শাসনাধীন ছিল। (এ বিষয়টির বিস্তারিত বিবরণ জন্মভূমির পরিচয় অধ্যায়ে পাওয়া যাবে)।

৯. হয়রত আকদাস (ক.) বিভিন্ন ধর্মের নৈতিক ক্ষেত্রে বা নৈতিকতায় যে, কোনো পার্থক্য নেই তা সম্যকভাবে অবগত ছিলেন। এ কারণে তিনি কোনো ধর্মের আচার ও ধর্মীয় প্রথার বিরুদ্ধে কিছু বলেন নি। তাঁর সমসাময়িক সব সম্প্রদায় জাতি ধর্ম নির্বিশেষে তাঁর গুণমুক্ত এবং শ্রেষ্ঠত্বের (আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্যের) সমর্থক ছিলেন ('জীবনী ও কেরামত' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)। এটা তাঁর মোজাদ্দেদিয়ত বা ধর্মক্ষেত্রে তাঁর পক্ষ থেকে (সংক্ষারকৃত) নতুনত্ব প্রদানের বিষয়টি বুঝায়। 'মোতালেবে রশিদী' গ্রন্থের ২৬৮ পৃষ্ঠায় 'ফরদুল আফরাদ' ব্যক্তিই বেলায়তে মোহাম্মদীর সূক্ষ্মত ও স্থুলত্বের (দ্র্শ্য-অদ্র্শ্য) সমাবেশকারী হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। নিজ শ্রেণির মধ্যে (বেলায়তে মোহাম্মদীর অলি-আল্লাহ ও বুজুর্গগণের মধ্যে) তিনি হাতের মধ্যাঙ্গুলি স্বরূপ, তাঁর আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্য (বুজগী) উচ্চতে বিকশিত ছিলো। এসব কারণে তাঁকে চারটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন খাতেমে বেলায়তে মোকাইয়্যাদায়ে মোহাম্মদী বা শৃঙ্খলিত বেলায়তী ধারার অবসানকারী এবং বেলায়তে মোত্লাকার সূচনাকারী খাতেমে অলদ বা আওলাদ বলা যায়। কারণগুলো হচ্ছে:

(ক) খাতেমুল অলি খাতেমুন্বীর পবিত্র ধর্মের অনুগত বিধায় তিনি পুত্র সন্তান রেখে যাননি। যা রসূলুল্লাহ (দ.) এর অনুরূপ।

(খ) হয়রত শীষ (আ.) এর 'নজরে ফিকরি. বা জ্ঞান জ্যোতির ধারক-বাহক হিসাবেও তিনি খাতেম। হয়রত শীর্ষ (আ.) এর জন্ম যেমন এক অসাধারণ জন্ম, তাঁর নীতির ধারক-বাহক বেলায়তে মোত্লাকাও এক নবযুগের সূচনাকারী হিসাবে অসাধারণ। ধর্মে নৈতিকতা পতনের যুগ যা ১১৪৩ হিয়রিতে হয়রত আবদুল গণি নাবলুসি (র.) এর ওফাতের পরে সূচিত হয়েছিলো। ১২৪৪ হিয়রি সনে অলিকুল শিরোমনি সুফি সন্ত্রাট হয়রত গাউসুল আয়ম মাওলানা শাহসুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভান্নারীর (ক.) আবির্ভাবে সূচিত যুগে নৈতিক ধর্মের পুনরুজ্জীবন সম্ভব হয়েছে। ছলচাতুরি, কৃত্রিমতা দূর করার মাধ্যমে, তাঁর বিশ্বত্রাণ কর্তৃত্বে, গাউসিয়তের প্রভাবে, সহজতম পছায় নৈতিক ধর্মের

পুনরুজ্জীবনকে তিনি সম্ভব করে তুলেছেন।

(গ) সব ধর্মের সূক্ষ্মত ও স্থুলত্বের সমাবেশকারী এবং সমসাময়িক সবার কাছে সম্মানিত ও প্রশংসিত হিসাবে বেলায়তে মোহাম্মদীর সম্পূর্ণ অধিকারীই 'ফরদুল আফরাদ'।

(ঘ) পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ধর্ম বা কর্মপন্থার বেষ্টনকারী হিসাবে তিনি বেলায়তে মোহিত বা বেলায়তে মোত্লাকার মালিক; যাকে নিয়বতাইনে আদমি বলে।

অতএব তাঁর পবিত্র অস্তিত্বে বা অজুনে পাকে উল্লেখিত শ্রেষ্ঠতম ফজিলতে রক্বানী বা বেলায়ত সম্পূর্ণভাবে বিকশিত হওয়ায় এটি অন্য কোনোখানে পুনঃবিকশিত হওয়া সম্ভব নয়। কারণ এর এস্তেহকাকে অজুনী বা বিকাশযোগ্যতা এখানে প্রস্ফুটিত ও পরিসমাপ্ত। সুতরাং তিনিই খাতেম বা বেলায়তে মোকাইয়্যাদার পরিণতিকারী (সমাপ্তিকারী) এবং বেলায়তে মোত্লাকার অধিকারী যুগ-প্রবর্তক অলি-আল্লাহ। তিনি বিশ্ব ধর্ম সাম্যের (ধর্মীয় সহাবস্থান) বিপ্লবাত্মক কর্মপন্থা 'সপ্ত পন্দতির' দাবিদার; বিশ্বত্রাণ কর্তৃত্বের 'আখের' শেষ গাউসুল আয়ম।

### সারানুবাদ : ড. সৈয়দ আবদুল ওয়াজেদ

#### টীকা ও তথ্যসূত্র :

বেলায়তে মোত্লাকা, ঘোড়শ সংক্ষরণ, ২০১৭ এর তৃতীয় পরিচ্ছদের সূচনা 'বেলায়তে মোকাইয়্যাদা' দ্রষ্টব্য, পৃ. ২৭

১. ফসুসুল হেকম (তরজমা), আল্লামা মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবি (র.), তাষা উর্দু, মোস্তাফায়ী প্রেস লক্ষ্মী, ফস্সে শীষ, পৃ. ৯৭
২. ফসুসুল হেকম, পৃ. ৩৯
৩. ফসুসুল হেকম, (খাতেমুল অলি সম্পর্কে আল্লামা মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবি (র.) এর ভবিষ্যদ্বাণী দ্রষ্টব্য সহায়কস্থৰ্থ:

১. ড. মুহম্মদ আবদুল মাল্লান চৌধুরী অনুদিত 'BELAYET-E-MUTLAKA (The Unchained Divine Relations or Unhindered Spiritual Love of God)' ইংরেজি দ্বিতীয় সংক্ষরণ, ২০১৭।

২. বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান, সংকলন ও সম্পাদনা : মোহাম্মদ হারুন রশিদ, প্রথম প্রকাশ : জৈষ্ঠ ১৪২২/ মে ২০১৫, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, বাংলাদেশ।

# বিশ্বনবী হ্যরত মুহাম্মদ (দ.) এর তাসাওউফ ধারা :

## নবুয়ত প্রকাশের পর নির্যাতিত বিশ্বনবী (দ.)

### ● অধ্যাপক জহুর উল আলম ●

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বিশ্বনবী (দ.) এর তাসাওউফ সাধনা চলে নির্জন পরিবেশে, একাকী-একাগ্রতায়, ফারান পর্বতের হেরো গুহায়। এ তথ্য এতো গোপনীয় ছিল যে, হ্যরত খাদিজা (রা.) ব্যতীত আর কেউ পুরোপুরি অবহিত ছিলেন না। নবীজী পরিবারের সদস্য হিসেবে হ্যরত আলী (রা.) এবং পালক পুত্র যায়েদ বিন হারিস (রা.) কিছু কিছু অবহিত ছিলেন। অর্থাৎ তাসাওউফ সাধনার বিষয়টি ছিল একান্ত এবং গোপনীয়। এটি প্রকাশ করার বিষয় ছিল না। তাসাওউফ মূলতঃ ব্যক্তিগত অর্জন, আত্মার শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের লক্ষ্যে আত্ম বিলোপনের বিষয়। অন্যদিকে নবুয়ত জনগণের হেদায়ত নির্দেশনামূলক বিষয় হওয়ায় তা জনসম্পৃক্ত এবং প্রকাশ্য ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বিষয়। কারণ মহান আল্লাহ নবী (দ.) কে প্রকাশ্য সতর্ককারী হিসেবে জনসমাজে প্রেরণ করেছেন। এর পরেও নবুয়ত প্রকাশের পর বিশ্বনবী (দ.) প্রথম তিন বৎসর অতি সংগোপনে নিরাকার আল্লাহর একত্ববাদ (তাওহীদ) এবং ইসলাম ধর্মের একান্ত দাওয়াত ঘনিষ্ঠদের নিকট পেশ করে নবুয়তের কার্যক্রমের সূত্রপাত করেন। তিন বছর পর প্রকাশ্য ইসলামের দাওয়াত প্রদানের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ নায়িল হয়। পবিত্র কোরআনে এ বিষয়ে উল্লেখ আছে, “যে বিষয়ে আপনাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করুন এবং মুশরিকদের পরোয়া করবেন না” -(সূরা হিয়র : ১৫:৯৪)। একই সময়ে নির্দেশনা আসে, “আর সর্বপ্রথম আপনার নিকট আত্মীয়দের সতর্ক করুন” -(সূরা শু'আরা : ২৬:২১৪)। পবিত্র কোরআনে এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ করা হয়, “তাদের সঙ্গে কোমল ও সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহার করুন। তারা যদি আপনাকে অমান্য করে, তবে তাদেরকে বলুন, তোমাদের কাজের দায় দায়িত্ব তোমাদের, আমি এ থেকে দায় মুক্ত”-(সূরা শু'আরা : ২৬:২১৫-২১৬)।

আল্লাহর পক্ষ থেকে এ ধরনের ঘোষণা এবং নির্দেশনা আসার পর মহানবী (দ.) সাফা পাহাড়ে উঠে কুরাইশ সম্প্রদায়ের প্রত্যেকের নাম ধরে ডাকেন। অতঃপর তিনি বলেন, “যদি আমি আপনাদের খবর দেই যে, পাহাড়ের অন্য প্রান্তে একদল সৈন্য জমায়েত হয়েছে, যারা আপনাদের উপর হামলার জন্য

প্রস্তুতি নিচ্ছে, তবে কি তা সত্য মনে করবেন? উপস্থিতি সকলেই একবাক্যে বলেন, অবশ্যই, কেন না আমরা তো আপনার মধ্যে সত্যবাদিতা ছাড়া কিছুই দেখিনি। তখন তিনি বলেন, আমি আপনাদের এক কঠিন শাস্তির ব্যাপারে সতর্ক করছি। তা হচ্ছে মূর্তি পূজার শিরকী গুণাহের শাস্তি। আমাদের ইলাহ শুধু একজন—“ইলাহ কুম ইলাহুন ওয়াহিদ”। তখন আবু লাহাব রেগে জ্বলে উঠে বললো, “তোমার ধৰ্ম হোক, তুমি কি এজন্যে আমাদেরকে একত্রিত করেছ?” আবু লাহাবের এ ধরনের ধৰ্ম কামনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহতা'আলা আবু লাহাবের ধৰ্ম কামনা করে সূরা লাহাব নায়িল করেন। সাফা পাহাড়েই মিনিট সময় পূর্বে যাঁকে সমবেত কুরাইশ প্রতিনিধিরা “আপনার মধ্যে সত্যবাদিতা ছাড়া কিছুই দেখিনি” বলে সাক্ষী দিয়েছেন তারাই আবার সঙ্গে সঙ্গে নিরাকার প্রভু, একমাত্র স্বীকৃত আবুল আলামীন সম্পর্কে ঘোষণা প্রদানের পর তাঁর ধৰ্ম কামনা করছে (নাউজুবিল্লাহ)।

এরপর আল্লাহর নির্দেশনা অনুযায়ী পবিত্র কোরআনের ঘোষণা মতে বিশ্ব নবী (দ.) নিকট আত্মীয়দের সতর্ক করার জন্যে ভোজের আয়োজন করেন। এটি ছিল মূলতঃ একটি মুয়িজাপূর্ণ অলৌকিক ঘটনা। এক সাঁশস্য, ছাগলের একটি রান এবং এক পেয়ালা দুধের মাধ্যমে চল্লিশ জনকে তৃষ্ণি সহকারে আপ্যায়নের পর আবু লাহাব “খাবারের উপর যাদু” করেছে বলে উল্লেখ করে উপস্থিতি সকলকে নিয়ে বের হয়ে যান। এদিন মহানবী (দ.) কোন কথা বলার সুযোগ পাননি। পরদিন তিনি একই উদ্দেশ্যে হ্যরত আলীকে (রা.) খাবার আয়োজনের নির্দেশ দেন। এদিনও সম্পরিমাণ লোক উপস্থিত হয়। খাবার শেষে সকলের উদ্দেশ্যে মহানবী (দ.) বলেন, “যে বস্তুটি আমি এবার আপনাদের সামনে পেশ করতে যাচ্ছি, এর চেয়ে উত্তম কোন বস্তু এর আগে কোন ব্যক্তি নিজ সম্প্রদায়ের কাছে পেশ করেনি। আমি আপনাদের জন্যে দুনিয়া ও আখিরাতের সংবাদ নিয়ে এসেছি।” এদিনও হ্যরত আলী (রা.) ব্যতীত অন্য সকলে আবু লাহাবের নির্দেশনা অনুযায়ী স্থান ত্যাগ করে। আবু জাহল (প্রকৃত নাম আবুল হাকাম), আবু লাহাব (প্রকৃত নাম আবদুল উয্যা) প্রমুখ কয়েকজন কুরাইশ নেতা তাওহীদের প্রতি আহ্বানের কারণে শুধু অনীহা প্রদর্শন করে

ক্ষান্ত হয়নি, বরং তৎসময়ের কুরাইশ সর্দার হ্যরত আবু তালিব সমীপে উপস্থিত হয়ে অভিযোগ উথাপন করে বলে যে, “আপনার ভাতিজা, আমাদের মূর্তিগুলোকে খারাপ বলছে, আমাদের ধর্মকে খারাপ বলছে, পূর্ব-পুরুষদের পথভ্রষ্ট বলছে। আপনি হয় তাকে নিষেধ করুন, না হয় তার এবং আমাদের মধ্যে কিছু হলে আপনি আসবেন না, আমরা নিজেরাই বোৰাপড়া করবো।” হ্যরত আবু তালিব তাদেরকে নম্রভাষায় বশীভূত করে বিদায় দেন। মহানবী (দ.) এ ধরনের অভিযোগের প্রতি কর্ণপাত না করে তাওহীদের দাওয়াত অঙ্গুল রাখেন। এতে আবু লাহাব, আবু জাহলরা ত্রোধের এবং হিংসার আগুনে জ্বলে উঠে।

দ্বিতীয় বার কুরাইশদের প্রতিনিধি দল হ্যরত আবু তালিব সমীপে আগমন করে বলে যে, “আপনার ভাতিজার কর্মকাণ্ড আমরা আর সহ্য করতে পারছি না। আপনি আপনার ভাতিজাকে বারণ করুন, অন্যথায় লড়াই করে আমাদের কোন এক পক্ষ শেষ হয়ে যাবে। এ ধরনের ভূমিকি ধর্মকি দিয়ে এরা চলে যায়। কুরাইশদের ঐক্যবন্ধ বিরোধিতায় হ্যরত আবু তালিবের মন তখন কিছুটা প্রভাবিত হয়ে পড়ে।

এ ধরনের উভেজনাপ্রবণ ভূমিকি-ধর্মকির পরিস্থিতিতে বিশ্বনবী হ্যরত মুহাম্মদ (দ.) যখন গৃহে তশরিফ আনেন তখন হ্যরত আবু তালিব বলেন, “হে প্রিয় বৎস! তোমার সম্প্রদায়ের লোকজন আমার কাছে এসেছিল এবং এসব বলে ভূমিকি দিয়ে চলে গেছে। কাজেই তুমি আমার প্রতি অনুগ্রহ করো এবং নিজের প্রতিও একটু নজর দাও। আমার ওপর সাধ্যাতীত বোৰা চাপিওনা।” এ ধরনের বাক্যালাপে নবীজী (দ.) এর মনে এ ধারণা উদয় হয় যে, হয়তো তাঁর চাচা তাকে এ ধরনের পরিস্থিতিতে সাহায্য-সহযোগিতা থেকে বিরত থাকতে চাইছেন। চাচার বক্তব্য শুনে অশ্রু সজল নয়নে, ভারাক্রান্ত হৃদয়ে মহানবী (দ.) দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে ঘোষণা দেন, “চাচাজান! আল্লাহর কসম, যদি তারা আমার ডান হাতে সূর্য এবং বাম হাতে চন্দ্রও এনে দেয় এবং বলে এ কাজ ছেড়ে দাও, তবুও আমি কখনো তা ছাড়তে পারবো না। যতোক্ষণ না আল্লাহ আমার দীনকে বিজয়ী করেন অথবা আমি ধ্বংস হয়ে যাই।” চাচা সমীপে নির্ভয়ে, নিঃসংকোচে একথা বলে কেঁদে ফেলেন হ্যরত মুহাম্মদ (দ.). চাচার সম্মুখ থেকে চলে যাবার কালে হ্যরত আবু তালিব বলেন, “হে ভাতিজা শোন! তোমার যা খুশি করো, আমি কখনোই তোমাকে শক্র হাতে তুলে দেব না।”

চাচার সঙ্গে কথোপকথনে মহানবী (দ.) এর পবিত্র যবান থেকে

যে সব বাক্য প্রকাশ পেয়েছে তাতে একমাত্র মহান আল্লাহর প্রতি নিঃশর্ত পরম আনুগত্য, প্রেম প্রাবল্য এবং আল্লাহ কর্তৃক তাঁর উপর অর্পিত সুমহান দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারের পূর্বে হ্যরত মুহাম্মদ (দ.) হ্যরত আকরাম (রা.) এর গৃহে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের (দ.) প্রতি পরম আনুগত্য প্রকাশ করে যাঁরা একত্রিত হতেন তাঁদেরকে মূলত মহানবী (দ.) নির্লোভ, নির্মোহ থেকে ধারণাতীত প্রেমানুগত্যের দীক্ষা দিয়ে একটি সুদক্ষ ‘MORAL BRIGADE’ (সুউচ্চ নৈতিক মানের দল) সৃষ্টির দ্বার উন্মোচন করেন। তাওহীদের প্রতি একান্ত অনুগত অনুগামী অনুসারীদের প্রতি এটি ছিল প্রাথমিক পর্যায়ের তাসাওউফ দীক্ষা। এ ধরনের দীক্ষার কারণে হ্যরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা.) এর পিতা হ্যরত ইয়াসির (রা.) কঠিন নির্যাতনের মুখে শাহাদতের পেয়ালা পান করেছেন, তবুও নিরাকার এক আল্লাহ ব্যতীত জালিমদের নিকট আত্মসমর্পণ করেন নি। আবু জাহলের পাশবিক নির্যাতনে নির্যাতিতা হয়ে হ্যরত আম্মার (রা.) এর বৃদ্ধা মাতা হ্যরত সুমাইয়া (রা.) সঙ্গে সঙ্গে শহীদ হন। ইসলাম ধর্মের জন্যে তিনি সর্বপ্রথম শহীদ হিসেবে সম্মানিত হয়ে আছেন।

জলন্ত অঙ্গারের উপর চিৎ করে শুইয়ে রেখে, তপ্ত রোদে লৌহ বর্ম পড়িয়ে, দাঁড় করিয়ে, পায়ে রশি বেঁধে হেঁচড়িয়ে, বস্তায় ভরে ধোঁয়া দিয়ে, পেট এবং বুকে বিশাল আকৃতির পাথর উঠিয়ে, রশি বেঁধে লটকিয়ে, অনবরত বেত্রাঘাত এবং মারপিট করে যাঁদেরকে এতুকু টলানো যায়নি, যাদের ঈমান এতো দৃঢ় ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল যে, যারা অনায়াসে জীবন কুরবানী দিতে দ্বিধা করেন নি তাদের প্রায় সকলেই হ্যরত আকরাম (রা.) এর দ্বারবন্ধ গৃহে মহানবী (দ.) থেকে সরাসরি সবক প্রাপ্ত ছিলেন। এদের মধ্যে বৃহৎ সংখ্যক ছিলেন সমাজের কথিত নিম্নবর্গ-দাস, দাসী। এরা তাদের কথিত এবং ধনিক ব্যক্তিদের সীমাহীন অত্যাচারেও আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের (দ.) আনুগত্য পরিত্যাগ করেন নি। ইসলাম ধর্মের প্রাথমিক সময়ের সীমাহীন দুর্দিনে জান এবং মাল দিয়ে নির্যাতিতদেরকে কথিত প্রভুর দাসত্ব থেকে মুক্ত করার জন্যে সর্বাঙ্গে এগিয়ে আসেন হ্যরত আবু বকর (রা.). অসহায়, নির্বাঙ্কুব, অভিভাবকহীন দুষ্ক্রদেরকে পাশবিক নির্যাতনের হাত থেকে মুক্ত করে তিনি (আবু বকর) গরীব-অবহেলিত মানুষকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণে, প্রচার এবং প্রসারে অনন্য ভূমিকা পালন করেন। কুরাইশদের নির্যাতনের মুখে ঈমানকে প্রাণবন্ত রাখার তাগিদে কেউ কেউ অচেল সম্পদ, স্বর্ণ-মণি-মানিক্যের মালিকানা এবং

লোভ লালসা পরিত্যাগ করে হ্যারত করেছেন। পবিত্র কোরআনে তাঁদের ত্যাগ এবং উৎসর্গকে মূল্যায়ন করে ঘোষণা এসেছে, “তোমাদের মধ্যে যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে আল্লাহর পথে ব্যয় করেছে ও সংগ্রাম করেছে তারা এবং পরবর্তীরা সমান নয়। যারা বিজয়ের পরে আল্লাহর পথে ব্যয় ও সংগ্রামে অংশ নিয়েছে তাদের চেয়ে পূর্ববর্তীরা মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ। তবে আল্লাহর পথে যারা ব্যয় ও সংগ্রাম করে তাদের সবার জন্যে আল্লাহ কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন”-(সূরা হাদিদ : আয়াতাংশ : ১০)।

তাওহীদ ও ইসলাম ধর্ম প্রচারে মহানবী (দ.) কে শারীরিক নির্যাতন, এমনকি হত্যার ভয় দেখিয়েও যখন বাধাগ্রস্ত করা অসম্ভব হচ্ছে, তখন কুরাইশ নেতারা বার বার বৈঠক করে অভিনব কৌশল অবলম্বন করতে থাকে। মহানবী (দ.) এর চাচা বীর কেশরী হ্যারত হাময়া (রা.) যখন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন তখন মুসলমানের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান দেখে কুরাইশেরা প্রতিক্রিয়া হিসেবে ইসলাম ধর্ম প্রচার বন্ধে অচেল অর্থ সম্পদ এবং আরবে বাদশাহী প্রদানের প্রলোভন দেখিয়ে আপোষ প্রস্তাব পেশ করে। মহানবী (দ.) তাদের প্রদত্ত প্রস্তাব, মান-সম্মান-নেতৃত্বের টোপ, পৃথিবীর সেরা ধনী ব্যক্তিতে পরিণত করার লোভ, সর্বোপরি আরবের বাদশাহীর মতো ক্ষমতা, প্রভাব-প্রতিপত্তির লোভ প্রত্যাখ্যান করে একমাত্র মহান স্বষ্টি আল্লাহর আনুগত্য ও মহিমা প্রচারকে অঙ্গীকার বলে ঘোষণা দেন।

কোন প্রকার লোভ, লালসা, ভয়ভীতিতে যখন হ্যারত মুহাম্মদ (দ.)-কে নমিত করা অসম্ভব হচ্ছে না, তখন কাফির-মুশরিকরা তাঁর চলার পথে কাঁটা বিছিয়ে, গালাগাল করে, গায়ে থুথু নিক্ষেপ করে, মাটি লাগিয়ে, পাথর ছুঁড়ে পবিত্র দেহ রক্ষণ করে, গলায় কাপড় পেঁচিয়ে শ্বাস বন্ধ করে মেরে ফেলার উপক্রম করে, মারধর করে বেঁশ করে, উটের নাড়িভুরি পিঠের উপর রেখে চরম প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে উঠে। ইতোমধ্যে কুরাইশদের জ্বালায় অতিষ্ঠ দুষ্ট মুসলিমদেরকে অত্যাচার থেকে রক্ষাকল্পে মহানবী (দ.) কতিপয় সাহাবাকে আবিসিনিয়ায় হ্যারতের ব্যবস্থা করেন। প্রথম দিকে পুরুষ মহিলা সমেত ষেলজন এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে পুরুষ-মহিলা মিলে একশত দুইজন আবিসিনিয়ায় গমন করে বাদশাহ নাজাশীর আতিথেয়তায় আশ্রয়প্রাপ্ত হন। কুরাইশ নেতারা হ্যারতকারীদের মক্কায় ফেরত আনার জন্যে বাদশাহ নাজাশীর নিকট ধর্না দেন। তারা মহানবী (দ.) এবং নবুয়ত দাবি সম্পর্কে নানাবিধি প্রশ্ন তুলে অপপ্রচারে লিপ্ত হয়। বাদশাহ-

নাজাশী কথিত কুরাইশ অভিজাতদের কথায় কর্ণপাত না করে হ্যারতকারীদের তাঁর দেশে বসবাসের অধিকার প্রদান করে জীবিকা নির্বাহের সু-ব্যবস্থা করেন। এই পর্যায়ে কুরাইশদের ব্যর্থতার পর তারা মহানবী (দ.) এর নবুয়তের সপ্তম বর্ষে বনী হাশিমের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে তাদেরকে সামাজিকভাবে বিছিন্ন করে ফেলার সিদ্ধান্ত নেয়। এ সময় তারা নিপীড়নমূলক চুক্তিপত্র লিখে কাবা গৃহের দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখে। এ ধরনের চুক্তিপত্রের কারণে বাধ্য হয়ে বনী হাশিম, বনী আবদুল মুত্তালিব বংশের মুমিন-কাফির নির্বিশেষে সকল নারী পুরুষ যুবক, তরুণ, কিশোর শিশুকে নিয়ে হ্যারত আবু তালিব শিয়াবে আবু তালিবে আশ্রয় নেন। এখানে তাঁরা তিন বৎসর অবরুদ্ধ হয়ে থাকেন। তাদের জন্য খাদ্য, পানীয় পোশাক পরিচ্ছদ সরবরাহ বন্ধ করে দেয়া হয়। কুরাইশ দলপতিদের ঘোষিত অবরোধ চলাকালে খাদ্যাভাব, পানীয় অভাবে গাছ পাতা, লতা-গুল্ম খেয়ে সকলকে জীবিকা নির্বাহ করতে হয়। আত্মীয় স্বজনরা খাদ্য দ্রব্য সরবরাহ করতে চাইলে আবু জাহলরা তাতে প্রচণ্ড বাধা দিত।

এ ধরনের নির্মম পরিস্থিতিতে মহানবী (দ.) দীর্ঘ তিন বৎসর অবরুদ্ধ অবস্থায় শিয়াবে আবু তালিবে অবস্থান করেন। অর্ধাহার, অনাহার এবং গাছের লতা-পাতা বনাজী ফল-মূল খেয়ে জীবন ধারণের তিক্ত অভিজ্ঞতা বিশ্বনবী (দ.), উম্মু মো'মিনীন হ্যারত খাদিজা (রা.) হ্যারত আলী (রা.), হ্যারত ফাতিমা (রা.) চাচা হ্যারত আবু তালিব সহ বনী হাশিম গোত্রের সকলকে অর্জন করতে হয়। এ ধরনের অবরোধ ও সমাজ বিছিন্ন জীবনাতিপাতের মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর প্রিয়তম নবীকে (দ.) ধৈর্য, সহনশীলতার পরীক্ষায় অত্যন্ত সফলভাবে উত্তীর্ণ করেন। নবুয়ত যেহেতু চিত্ত-চাঞ্চল্য এবং অস্থিরতার বিষয় নয়, সেহেতু মানসিক দৃঢ়তা এবং সুস্থিরতা অর্জনের জন্যে আল্লাহর তরফ থেকে এটি একটি প্রত্যক্ষ দীক্ষা হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। একই সঙ্গে আল্লাহ তাঁর সৃষ্টি জগতে ভাল-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণ, শিষ্ট-অশিষ্ট, ন্যায়-অন্যায়, সত্য-মিথ্যা, সৎ-অসৎ মোতাকী-জালিম প্রভৃতি পরম্পর বিরোধী ধারাকে বহাল রেখে সত্য পথে অবিচল থাকার জন্যে পরীক্ষামূলক পস্তা চালু রেখেছেন- যাতে সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ কল্যাণ সম্পর্কে ধারণা প্রাপ্ত হয়। কারণ কল্যাণই হচ্ছে সৃষ্টি জগতের জন্যে আল্লাহর কামনা। ঘাত-প্রতিঘাতের মাধ্যমে মানুষ ইহসান প্রাপ্ত হোক, একমাত্র আল্লাহর প্রেমে একাগ্র হোক- এ জন্যে আল্লাহ তার প্রিয় নবী-রাসূল এবং অলি-দরবেশদেরকে কষ্ট সাধনার মাধ্যমে গড়ে তুলেন।

মহানবী (দ.) এবং বনী হাশিম গোত্রের অবরুদ্ধ জীবন থেকে তাসাওউফ সাধকরা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সম্ভব্য করে নিজেদের জীবনকে আলোতে আলোকময় করে তুলেন। উল্লেখ্য যে অবরোধ চলাকালে আবু জাহল-আবু লাহাবের নির্দেশনা এবং দৌরাত্ত্বে ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারী, নিরাকার আল্লাহতে বিশ্বাসী মুসলমানদের নিকট পণ্য সামগ্রী বিক্রয় এমনকি বাণিজ্য কাফেলার আগমন ঘটলে মুসলমানদের নিকট পণ্য বিক্রয়ে বাধা প্রদান করা হতো। ফলে অবরোধ বহির্ভূত হওয়া সত্ত্বেও সাহাবা কেরামকেও খাদ্যাভাবের কারণে অনাহারে অভুত থেকে দুঃখ যাতনা ভোগ করতে হয়েছে। হিংসা-বিদ্বেষ, সামাজিক বয়কট, নির্যাতন-নিপীড়ন, অবজ্ঞা এবং তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের আচরণ ভোগ করে সাহাবা কেরামের অর্জিত অভিজ্ঞতা তাঁদেরকে পরশ পাথরে পরিণত করে স্থলে। শিয়াবে আবু তালিবে অবরুদ্ধ জীবন এবং অবরোধ বহির্ভূত ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারীদের উপর পরোক্ষ অবরোধ আরোপের ঘটনা প্রবাহ পরবর্তীকালে তাসাওউফ সাধকরা ঐশী ফজিলত অর্জনের পস্তা হিসেবে পাহাড়, পর্বত, বন জঙ্গলে নির্জনে থেকে কষ্টসাধ্য রিয়াজতকে আলিঙ্গন করে থাকেন। উল্লেখ্য যে, অবরোধের তিন বৎসর সময়ে কুরাইশদের চুক্তিনামা মহান আল্লাহর অনুপম ইচ্ছায় ‘আল্লাহ’ নাম ব্যতীত বাকী সবটুকু পোকায় খেয়ে ফেলে। অদৃশ্য জগতের এ সংবাদ মহানবী (দ.) তাঁর চাচা হ্যরত আবু তালিবকে অবহিত করেন। হ্যরত আবু তালিব তা কুরাইশ নেতাদের জ্ঞাত করেন এবং তদন্তে তা সত্য প্রমাণিত হয়।

শিয়াবে আবু তালিবে অবরোধ চলাকালে অনাহারে, উপবাসে এবং অখাদ্য খেয়ে বয়োবৃদ্ধ হ্যরত আবু তালিব এবং উম্মুল মু'মিনীন হ্যরত খাদিজা (রা.) অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েন। শিয়াবে আবু তালিব থেকে বের হওয়ার কয়েকদিন পর হ্যরত আবু তালিবের তিন থেকে পাঁচ দিনের মধ্যে মহান মহীয়সী হ্যরত খাদিজাতুল কোবরা (রা.) ও বেচাল প্রাণ্ত হন। চাচা আবু তালিবের পরলোক গমনের পর হ্যরত আমীর হাময়া (রা.) ব্যতীত স্বীয় গোত্রীয় আত্মীয় স্বজন থেকে মহানবী (দ.) আর কোন সাহায্য পাননি। এদিকে শোকের উপর শোক তথা হ্যরত খাদিজাতুল কোবরার (রা.) ওফাতের পর সান্ত্বনা এবং সহানুভূতি দানকারীও তেমন কেউ নেই। এ ধরনের বিষণ্ন পরিস্থিতিতে মহানবী (দ.) তাওহীদের দাওয়াত দিতে হ্যরত যায়েদ ইবনে হারিস (রা.) কে সঙ্গে নিয়ে তায়েফ গমন করেন। সেখানে তিনি নেতৃস্থানীয় তিনি সহোদর আবদ ইয়ালিস, মাসউদ ও

হাবীবকে তাওহীদ এবং রিসালতের দাওয়াত প্রদান করলে তারা ঝুঁত ভাষায় তা প্রত্যাখ্যান করে। এরা দাওয়াত গ্রহণ করার পরিবর্তে দুচরিত্র বখাটে ভবযুরে সন্ত্রাসী ছেলেদের তাঁর প্রতি পাথর নিষ্কেপ করতে এবং ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে লেলিয়ে দেয়। সন্ত্রাসী জালিমদের নিষ্কিপ্ত পাথরের আঘাতে বিশ্বনবী (দ.) ভীষণভাবে আহত হন। আঘাতের যন্ত্রণায় এক পর্যায়ে তিনি বসে পড়েন। এ সময় জালিমরা তাঁর পবিত্র বাহু ধরে দাঁড় করিয়ে পুনরায় পাথর নিষ্কেপ করে এবং তা নিয়ে হাসি তামাসা করে। শোকের বছরে শোক বিহুল মহানবী (দ.) এ ধরনের যাতনা এবং নিপীড়ন সহ্য করে তাওহীদের দাওয়াত অব্যাহত রাখেন। শিয়াবে আবু তালিবে অবরোধ, শোকের বছরে তায়েফে অপমান-অপদস্থতায় অনেকাংশে নিঃসঙ্গ বিশ্বনবী (দ.)-কে মহান আল্লাহ অতুলনীয় সম্মান এবং ইজত দিয়ে মিরাজ প্রদান করেন। ইতোপূর্বে এ ধরনের ঘটনা অন্য কোন নবী-রাসূলের ক্ষেত্রে ঘটেনি। মিরাজ তথা স্রষ্টার সঙ্গে সৃষ্টির “মুআনাকারে ইশ্ক” প্রেমদোরে আলিঙ্গনাবদ্ধ হবার ঘটনায় বিশ্ব নবী (দ.) সকল সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠতমের মুকুট লাভে ধন্য হন। আল্লাহ মহামহিম এ সম্মান অন্য কাউকে দেননি। মিরাজের ঘটনা “ইনসানে কমিল” হবার লক্ষ্যে তাসাওউফ সাধকদের জন্যে পরম আত্মবিলয়ের উপলক্ষ্মি এবং অনুশীলনী পস্তাও বটে। মিরাজ শরিফ তাসাওউফ সাধকদের জন্য অনন্ত অসীম প্রেরণাধারা হিসেবে স্বীকৃত হয়ে আছে। (চলবে)

## সুফি উদ্ধৃতি

- যে ব্যক্তি আল্লাহকে চিনেছেন, তাঁর কাছে কোন কিছুই গোপন থাকে না।
- মনকে আল্লাহর দরবারে হাজির রাখবে। তাহলে শয়তান সেখানে স্থান পাবে না।
- আমি উচ্চমর্যাদা তালাশ করেছিলাম, বিনয় দ্বারা তা লাভ করলাম। নেতৃত্ব তালাশ করেছিলাম, সত্যের মধ্যে তা পেয়েছি। গৌরব তালাশ করেছিলাম, দারিদ্র্য'র মধ্যে তা পেয়েছি। আভিজ্ঞাত্য তালাশ করেছি, পরহেয়গারীর মধ্যে তা লাভ করেছি। মহত্ত চেয়েছি, অল্লে তুষ্ট থাকার মধ্যে তা লাভ করেছি। অপরের উপর নির্ভরশীল না হওয়ার কামনা করেছিলাম, আল্লাহর উপর তাওয়াকুল ভরসা করে তা লাভ করেছি।

হয়েরত গাউসুল আয়ম শাহসুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (ক.) এবং  
শাহানশাহ হয়েরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) খোদাদাদ বৈশিষ্ট্য

# তাইয়ে যমান ও তাইয়ে আরদ্

[সময় ও স্থানের ব্যবধান সংক্ষেপ]

॥ মোঃ মাহবুব উল আলম ॥

॥ ১ ॥

[আসমান-জমিনের সব কিছু মানবজাতির  
আয়ত্তাধীন -আল-কোরআন]

আল্লাহ রাবুল আলামিন পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে  
মানব জাতি/শ্রেণিকে [(উমামুন) ৬:৩৮] সৃষ্টি করে পার্থিব  
জীবনকালে পৃথিবীতে প্রয়োগযোগ্য সীমিত কিছু শক্তি, ক্ষমতা  
আমানত হিসেবে ডেলিগেট করেন নির্দেশিত পছায়  
সম্ব্যবহারের শর্তে। আল্লাহ তাঁর এই প্রকল্প কার্যকর করার  
উদ্দেশ্যে “নিজ অনুগ্রহে আসমান ও জমিনের সবকিছুকে  
তোমাদের আয়ত্তাধীন করে দিয়েছেন; নিঃসন্দেহে চিন্তাশীল  
কওমের জন্য এতে নির্দর্শন রয়েছে (৪৫:১৩)।” একই সূরায়  
উক্ত আয়াতের পূর্ব আয়াতে পার্থিব জীবন-ঘনিষ্ঠ বাস্তবতার  
প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য রেখে বলা হয়েছে : “আল্লাহই তো  
নদী-সমুদ্রকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন, যাতে তাঁরই  
নির্দেশে নৌকা-জাহাজ উহার মধ্যে চলাচল করতে পারে।  
যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ তালাশ করতে পারো এবং তোমরা  
শোকর আদায় করো (৪৫:১২)।”

প্রকৃতির উপর মানবের প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণের কৌশল-ক্ষমতা  
বরাদের তথ্য প্রদানের মধ্যেই আল-কোরআনের বয়ান  
সীমাবদ্ধ থাকেনি। উপরন্তু দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নির্বাহের  
আবশ্যকীয় উপকরণের সহজ সরবরাহের বিবরণও বর্ণনা করা  
হয়েছে: “তারা কি দেখে না যে, আমি তাদের জন্য আমার  
(কুদরতের) হাতে সৃষ্টি জিনিষগুলির মধ্যে গৃহপালিত চতুর্পদ  
জন্মও সৃষ্টি করেছি! অতঃপর তারা এগুলোর মালিক হয়েছে।  
আমি এগুলোকে তাদের বশীভূত করে দিয়েছি, ফলে তারা  
এগুলোর কোনটার উপর সওয়ার হয় এবং কোনটিকে আহার  
করে তাদের জন্য এগুলোর মধ্যে বহু উপকারিতা ও পানীয়  
রয়েছে। তবু কি তারা শোকর করবে না? (৩৬:৭১-৭৩)।”  
আল-কোরআন এভাবে অন্যান্য অনেক কিছুর মধ্যে প্রকৃতি  
জগৎ, প্রাণী জগৎ বস্তুজগতের উপর মানুষের নিজের জন্য

প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার রূপরেখা অঙ্কন করে দিয়েছে।

॥ ২ ॥

কোরআনের প্রত্যেক বয়ান বা বিবরণ পাশাপাশি বাস্তব  
দৃষ্টান্তপুষ্ট-

আল-কোরআনের অন্যতম বুদ্ধিগুরুত্বিক বৈশিষ্ট্য এই যে, এই  
গ্রন্থের প্রত্যেক বয়ানের (proposition) স্বপক্ষে স্বীকৃত  
দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে। এসব দৃষ্টান্ত চর্মচক্ষে দৃশ্যমান,  
লিখিত তথ্যপুষ্ট ক্ষেত্রে বিশেষ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ সমৃদ্ধ।  
এসব দৃষ্টান্ত সমাবায়ে একটা বিশেষ জ্ঞানগর্ভ (glossary)  
গ্লোসারী প্রণীত হতে পারে। উপরের প্রথম অধ্যায়ে মানবকে  
অর্পিত ক্ষমতার অনেক দৃষ্টান্তের মধ্যে হয়েরত দাউদ (আ.)  
এবং হয়েরত সোলায়মান (আ.)-এর দৃষ্টান্ত উল্লেখযোগ্য।  
হয়েরত দাউদ (আ.) (খ. পু. ১০৮৬-খ. পু. ১০১৫ সন)  
আল-কোরআনের নয়টি সূরায় মোট ১৬ স্থানে হয়েরত দাউদের  
(আ.) প্রাসঙ্গিক বর্ণনা রয়েছে। তাঁকে শৈশবে মেষপালকের  
দায়িত্ব পালন করতে দেখা যায়। সমকালীন নবী হয়েরত  
শামুয়েল (আ.) জনগণের আবেদনের প্রেক্ষিতে তালুতকে  
প্রশাসক নিযুক্ত করেন (২:২৪৬-৭) তিনি জালেম হানাদার  
জালুতের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন অন্যান্য বিষয়ের  
মধ্যে তার লুঠিত তাবুত-ই-সাকিনা (Ark of the  
covenant) উদ্ধারের জন্য। এ যুদ্ধে হয়েরত দাউদ (আ.)  
সাধারণ সৈনিক হিসেবে যোগ দেন। যুদ্ধে অসম সাহসিকতার  
পরিচয় দেন এবং সমগ্র ইস্রাইলী জাতির প্রিয় পাত্রে পরিণত  
হন। তালুত তাঁর পূর্ব ঘোষণা মোতাবেক রাজত্বের অর্ধেক এবং  
স্বীয় কন্যাকে তাঁর সাথে বিবাহ দেন। এভাবে একজন  
অপরিচিত মেষ পালকের সন্তান দাউদ (আ.) শাসকপদে  
অভিষিক্ত হন। অতঃপর আল্লাহ তাঁর নিকট ওহী প্রেরণ করেন  
এবং যবুর কিতাব দান করেন (৪:১৬৩)। হয়েরত দাউদের  
(আ.) নির্জন সাধনা এবং সুপ্রশাসন মানব সভ্যতা-সংস্কৃতির  
প্রগতিশীল বিকাশের ইতিহাসে বিশাল মাইল ফলক।

পাহাড়-পর্বত ও বিহঙ্গকুল হযরত দাউদের (আ.) সাথে আল্লাহর যিকির ও মহিমা ঘোষণা করে (২১:৯৭)। আল্লাহ তাকে বিপুল প্রজ্ঞাদান করেন। লৌহের ব্যবহারসহ যুদ্ধ বর্ম তৈরি শিক্ষা দেন। তিনি নিজ শ্রমে উপার্জিত সম্পদে জীবিকা নির্বাহ করতেন। তিনি পাখীদের ভাষাও বুঝতেন।

### হযরত সুলায়মান (আ.) খৃ. পৃ. ১৯২-খৃ. পৃ. ১৪২ আনু.

হযরত সুলায়মান (আ.) হলেন হযরত দাউদ (আ.)-এর পুত্র। আল-কোরআনের সাতটি সূরায় ১৫টি আয়াতে মোট ১৭ বার তাঁর নামের উল্লেখ রয়েছে। নবী-রসূলদের হাজার হাজার বছরের ইতিহাসে তিনিই একমাত্র ব্যতিক্রম। যিনি অন্যান্য নবীদের মতো সমাজের একেবারে ত্ণমূল সর্বহারা স্তর থেকে উদ্ভূত নন; কিন্তু তিনি জ্ঞানে গরিমায়-বিচক্ষণতায়-বিজ্ঞান চর্চায় শীর্ষ-স্থানীয়দের অন্যতম। হযরত দাউদ (আ.) ধাতব পদার্থের ব্যবহারে যেমন পারদশী ছিলেন, তেমনি বিচার-বুদ্ধি-প্রশাসন ক্ষেত্রে ছিলেন আদর্শ স্থানীয়, যে কারণে তিনি ‘খলিফাতুল্লাহ’ বা আল্লাহর খলিফা উপাধিতে ভূষিত আল-কোরআনে। হযরত সুলায়মান (আ.) এর ছিল এই মহান উত্তরাধিকার এবং আল্লাহর অবদান ধারণ ও আত্মস্থ করার মতো ক্ষমতা।

এই মহান পিতা-পুত্র সম্পর্কে আল-কোরআন এর সাক্ষ্য: “আমি অবশ্যই দাউদ ও সুলায়মানকে জ্ঞান দান করেছিলাম এবং তাঁরা উভয়েই বলেছিলেন, সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাদেরকে তাঁর বহু মুমিন বান্দার উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। সুলায়মান হয়েছিলেন দাউদের উত্তরাধিকারী এবং তিনি বলেছিলেন, হে মানুষ! আমাকে বিহঙ্গকুলের ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এবং আমাকে সকল কিছু দেওয়া হয়েছে, এটা অবশ্যই সুস্পষ্ট অনুগ্রহ। সুলায়মানের সম্মুখে সমবেত করা হলো তার বাহিনীকে-জিন, মানুষ ও বিহঙ্গকুলকে এবং তাদেরকে বিন্যস্ত করা হলো বিভিন্ন ব্যুহে (২৭:১৫-১৭)। আরো বলা হয়েছে: “আমি সুলায়মানের অধীন করেছিলাম বায়ুকে, যাতে প্রভাতে একমাসের পথ, সন্ধ্যায় এক মাসের পথ অতিক্রম করতেন।

আমি তাঁর জন্য গলিত তাম্রের এক প্রস্তরণ প্রবাহিত করেছিলাম (৩৪:১২)।” আরো আছে: “আমি তাঁর অধীন করেছিলাম বায়ুকে, যা তাঁর আদেশে, তিনি যেখানে ইচ্ছা করতেন, সেখানে মৃদু মন্দভাবে প্রবাহিত হতো (৩৪:৩৬)। হযরত সুলায়মান (আ.) এক বিশাল সামুদ্রিক নৌবহর, জাহাজ নির্মাণ শিল্প, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যবৃত্ত গড়ে তুলেছিলেন।

অতএব, আল-কুরআনের এই দুটো মাত্র সাক্ষ্য থেকে পরিষ্কার বোধগম্য হয়-সূরা জাসিয়ার ১৩নং আয়াতের মর্মবন্ধ, যা নিবন্ধের প্রথম অনুচ্ছেদে উদ্ভৃত করা হয়েছে এবং যা মানবকে অর্পিত আল্লাহর প্রদত্ত ক্ষমতার প্রমাণ স্বরূপ।

॥ ৩ ॥

### হযরত দাউদকে (আ.) ‘তাইয়ে আরদ্ ও তাইয়ে যমান’

#### সূচক ক্ষমতা মঞ্জুর-

উপরের অধ্যায়ে দেখা গেল যে, আল্লাহ রাবুল আলামিন হযরত দাউদকে (আ.) পৃথিবীতে তাঁর জীবৎকালে মানব ছাড়াও অপরাপর প্রাণীকুল, পাহাড়-বৃক্ষ প্রকৃতিকে তাঁর অনুসরণকারী সাথী বানিয়ে দিয়েছিলেন। এই মেহেরবানী হযরত সুলায়মানের (আ.) উপরও বর্ষিত হয়েছিল। শুধু তাই নয়, তাঁকে তাইয়ে যমান (সময়ের ব্যবধান সংকোচন) সূচক ক্ষমতাও অর্পণ করা হয়েছিল।

বোখারী শরিফের এক হাদিসে হযরত আবু হোরায়রার (রা.) বরাতে বর্ণিত আছে: “নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দাউদের (আ.) পক্ষে আসমানী কিতাব যবুরের তেলাওয়াত অতি সহজ করে দেওয়া হয়েছিল। এমন কি তিনি স্বীয় যানবাহনের উপর জিন বা গদি ও আসন বাঁধবার নির্দেশ দিয়ে যবুর তেলাওয়াত আরম্ভ করতেন। জিন বাঁধা শেষ হবার পূর্বেই দাউদ (আ.) যবুর তেলাওয়াত সমাপ্ত করতেন। আর হযরত দাউদ (আ.) শুধু নিজ হস্ত-কার্যের উপার্জন দ্বারা স্বীয় ব্যয় নির্বাহ করতেন।”

এই তৎপর্যপূর্ণ হাদিসের সূত্র ধরে মহান হাদিসবেতা ও মুফাসিসিরগণ জানান; আল্লাহর কুদরতের অনিবর্চনীয় চিহ্নের অন্যতম ক্ষুদ্র দুটো নির্দশন হলো; তাইয়ে আরদ্ অর্থাৎ অনেক দূরত্বের ব্যবধানে অবস্থিত দুটো স্থানের দূরত্ব ও ব্যবধান ব্যক্তি বিশেষের জন্য বাস্তবে ভ্রাস করে দেওয়া। একই প্রক্রিয়ায় আর একটি ব্যবস্থা হয় সময় ও কালের ক্ষেত্রে, যা ‘তাইয়ে যমান’ নামে অভিহিত। অর্থাৎ স্বাভাবিক পরিমাপক হিসাবে যা দীর্ঘ সময়, তা ব্যক্তি বিশেষের জন্য স্বল্পতর হয়ে যাওয়া। হযরত দাউদের (আ.) যবুর তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ লক্ষ্যণীয়। এটা বিস্ময়কর তেমন কিছু নয়। সূরা ইয়াসীন সহ অন্যান্য কতিপয় আয়াতে যেমনটা বর্ণিত হয়েছে: “ওয়া হ্যাল খাল্লাকুল আলিম। ইয়া আরাদা শাইয়ান আঁই ইয়াকুলা লাহু কুন ফা ইয়াকুন। ফাসুবহানাল্লাজী বিয়াদিহী, মানাকুত কুল্লি শাইয়িওঁ ওয়া ইলাইহি তুরযাউন (৩৬:৮১-৮৩)। [বাংলা তরয়মা: তিনি মহাস্তো মহাজ্ঞানী। তিনি যখন কোন কিছু সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করেন, তখন শুধু উহাকে আদেশ করেন, ‘হও’।

তখনই তা হয়ে যায়। অতএব, পবিত্রতা আল্লাহরই, যার হাতে সব কিছুর সর্বময় কর্তৃত; আর তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।]

আল-কুরআনে বিবৃত তৌহিদবাদে বিশ্বাসীরা নিজেদের ক্ষুদ্রত্ব ও সসীমতা সম্বন্ধে সচেতন থেকে মহাজ্ঞানী মহাস্মৃষ্টির অন্তহীন ব্যাপকতায় আত্মসমর্পণ করেন। কাজেই তাঁরা আল্লাহর ‘ইচ্ছা-আদেশের কার্যকারিতায় নিরঙ্গুশ বিশ্বাসী, যা ঈমানের সর্ব প্রধান ও প্রথম শর্ত। পদার্থ বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতি স্ফুটা ও সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে নব নব তথ্য মানব জাতির সম্মুখে তুলে ধরছে।

## ॥৪॥

**হ্যরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) ও শাহানশাহ  
হ্যরত জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর (ক.) তাইয়ে যমান ও  
তাইয়ে আরদু বিষয়ক ঘটনা:**

(ক) ‘গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর জীবনী ও কেরামত গ্রন্থের অয়োবিংশ পরিচ্ছেদে ‘হ্যরতের অপূর্ব কেরামত: ব্যাপ্তের কবল হইতে প্রাণ রক্ষা’ শীর্ষক নিবন্ধে প্রকাশ্য দিবালোকে সংঘটিত ও বহুল জ্ঞাত যে বাস্তব ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে, তাতে দেখা যায় যে, মাইজভাণ্ডার শরিফে আগমনকারী বরিশাল নিবাসী এক ভক্তকে তাত্ক্ষণিকভাবে লাঠির আঘাতে বাঘের কবল থেকে রক্ষা করেন হ্যরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.)। নিজামপুর থেকে পার্বত্য পথে আসার সময় এ ঘটনা ঘটে। উদ্ধারপ্রাপ্ত ব্যক্তি হ্যরত আকদাসের পাশে লাঠি দেখে চিনে তাঁর কদমে ডুকরে কেঁদে লুটিয়ে পড়লে তিনি যে উক্তি করেন, তা নিতান্তই প্রণিধানযোগ্য। হ্যরত বলেন, “মি এও! আল্লাহর কুদরত দেখিয়া এতই আশ্চর্যান্বিত হইতেছে কেন? আল্লাহতায়ালা ইহা অপেক্ষা আরো দয়ালু। আরো ক্ষমতাবান। তিনি সব কিছু করিতে পারেন”। তাঁর এই উক্তি উপরে উল্লিখিত সূরা ইয়াসিনের শেষ তিন আয়াতের মর্মবাণীর সাথে কতোই না সঙ্গতিপূর্ণ!

(খ) একই গ্রন্থে বর্ণিত ‘হ্যরতের অদ্ভুত আধ্যাত্মিক প্রভাবে ব্যাপ্তের মুখে লোটা নিক্ষেপে ভক্ত উদ্ধার’ শীর্ষক ঘটনার বিবরণে দেখা যায় যে, হ্যরত আকদাস তাঁর বর্তমান রওজা সংলগ্ন পুরুরে তাঁর হস্তস্থিত লোটা আচম্বিতে এই বলে নিক্ষেপ করেন যে, ‘হারামজাদা তুই এখান হইতে দূর হস নাই?’। লোটা সকলে পুরুরে নিক্ষিপ্ত হতে দেখল। কিন্তু বহু খুঁজেও পুরুরে পাওয়া গেলো না। ঘটনার দু'দিন পর রাঙ্গুনিয়া নিবাসী আচমত আলী ঐ লোটা নিয়ে দরবারে হাজির হলেন এবং সর্ব সমক্ষে প্রকৃত ঘটনার বিবরণ দেন। সেই লোটা এখনো

বিদ্যমান। হ্যরত আকদাসের উপরোক্ত দুটো ঘটনা দৃশ্যতঃ তাইয়ে আরদু সূত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট।

(গ) তাঁর জীবনী গ্রন্থে দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদে ‘সূর্যের উপর আধ্যাত্মিক প্রভাব শীর্ষক নিবন্ধে বর্ণিত ঘটনা ‘তাইয়ে যমান’ সূত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট। এতে বর্ণিত হয়েছে; নানুপুর নিবাসী মুসিং খায়ের উদ্দিন ডাঙ্গার সাহেবের পর্দানশীন ভাতুস্পুত্রী দরবার শরিফে রাতভর ইবাদত-বন্দেগীতে অতিবাহিত করে সূর্য উঠার আগে বাড়ি ফিরতে মনস্ত করেন। যাতে কোন পুরুষের নজরে না পড়েন। তন্দ্রা টুটতে তিনি দেখেন সূর্য উঠি-উঠি করছে। তিনি হ্যরত আকদাসের কাছে আর্জি দিলেন, কী করবেন। হ্যরত বললেন, “তোমার কোন প্রকার আশঙ্কা নাই। তোমাকে কেহ দেখিবেনা। সূর্য উদয়ের পূর্বেই তুমি বাড়ি পৌঁছিয়া যাইবে। আল্লাহ আল্লাহ করিয়া নিরংদেবে বাড়ি ফিরিয়া যাও।” দরবার শরিফ থেকে সাড়ে তিন মাইল দূরে নিজ বাড়িতে তিনি পৌঁছলেন সূর্যোদয়ের পূর্বেই। এর ব্যাখ্যা নিষ্পত্তয়োজন। এটা সাদা-মাটোভাবে তাইয়ে যমান সূত্র সংশ্লিষ্ট ঘটনা।

(খ) শাহানশাহ হ্যরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) জীবৎকালে একই সময়ে একাধিকস্থানে উপস্থিত, বিভিন্নজনকে আল্লাহর ইচ্ছার মদদ প্রদানের ঘটনার বিবরণ তাঁর জীবনী গ্রন্থে বর্ণিত আছে। জামাল আহমদ সিকদার বিরচিত তাঁর প্রামাণ্য জীবনী গ্রন্থে বর্ণিত বহু ঘটনা ‘তাইয়ে যমান ও তাইয়ে আরদু-সূত্রের সাথে সম্পর্কিত। যা নিবিষ্ট মনে চিন্তা করলে সহজেই প্রতিভাত হয়।

## ॥৫॥

**তাইয়ে যমান ও তাইয়ে আরদু সংশ্লিষ্ট আরো কয়েকটা  
বাস্তব ঘটনা :**

(ক) হ্যরত শাহ আমানত শাহ (র.), চট্টগ্রাম চট্টগ্রাম মহানগরীর মহান অলি-আল্লাহ হ্যরত শাহ আমানত খান (র.) চট্টগ্রাম আদালতে দৃশ্যত: জজের পাখা বরদার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। কঞ্চিবাজারের এক ফরিয়াদী তার মামলার কাগজপত্র বাড়িতে ভুলে রেখে এসে খুব বামেলায় পড়ে। জজ পরদিন তাকে কাগজপত্র আদালতে পেশ করার হুকুম দেন। কিন্তু তখনকার যোগাযোগ ব্যবস্থায় তা মোটেও সংভব ছিল না। তার আকুল কান্নায় ব্যাকুল হয়ে হ্যরত শাহ আমানত (র.) তাকে জিজ্ঞেস করে ঘটনা অবহিত হন এবং তাকে চোখ বন্ধ করে তাঁর নির্দেশের অপেক্ষায় থাকার পরামর্শ দেন। এভাবে সে এক পলকে বাড়ি পৌঁছে কাগজ হাতে নিয়ে আর এক পলকে চট্টগ্রাম শহরে হাজির হয় এবং পরদিন আদালতে তা পেশ করে। মাত্র এক রাতে কঞ্চিবাজার থেকে

কাগজ আনার ঘটনা জজ সাহেবের প্রত্যয় হয়নি এবং তাকে সত্য গোপনকারী সাব্যস্ত করতে উদ্যত হলে সে প্রকাশ্য আদালত কক্ষে পাখা বরদারের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে সব কথা খুলে বলে। হয়রত আমানত শাহ (র.) ঐ দিনই আদালত কর্মসূল ছেড়ে তাঁর বর্তমান মাজার শরিফ এলাকায় নির্জন জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে রূহানী কর্ম জগতে ব্যাপৃত হন। এই মশহুর ঘটনা এখনো জীবন্ত। এটা তাইয়ে যমান ও তাইয়ে আরদের যৌথ দৃষ্টান্ত।

#### (খ) হয়রত বড়গীর আবদুল কাদের জিলানী (র.)

প্রতিরাতে একাধিকবার কোরআন তেলাওয়াত খত্ম করতেন, যা সর্বজনবিদিত। এটা হয়রত দাউদ (আ.)-এর যবুর পাঠের ঘটনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তিনি প্রতি রাতের প্রথমাংশে নামায প্রভৃতি সমাপন, দ্বিতীয়াংশে জিকির আজকার এবং তৃতীয়াংশে এক পায়ে দাঁড়িয়ে এক খত্ম কোরআন আদায় করতেন। তাঁর দৈনন্দিন ইবাদত বন্দেগীর এই রুটিনে হয়রত দাউদের (আ.) সামাজিক কর্ম রুটিনের আঁচ পাওয়া যায়।

#### (গ) তাইয়ে যমান ও তাইয়ে আরদ বিষয়ক আরো কয়েকটা নজীর

(১) “বোখারী শরিফ-এর বাংলা তরয়মা ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা নবীদের ইতিহাস খণ্ড, (৪ৰ্থ খণ্ড)” হয়রত দাউদের (আ.) অধ্যায়ের টীকায় বর্ণিত হয়েছে:

“হয়রত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের মধ্যেও অনেক অনেক ওলীর দ্বারা এইরূপ ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে। হিয়রী একাদশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ আলেম শেখ নুরুল্লাহ আলী ইবনে সুলতান- মোল্লা আলী কুরারী (রা.) মেশকাত শরিফের ব্যাখ্যায় তাঁর সুপ্রসিদ্ধ কিতাব ‘মেরকুত’ ৫-৩৪৪ পৃষ্ঠায় মোল্লা জামীর এক কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়ে প্রদান করিয়াছেন যে, একজন বিশিষ্ট বুজুর্গ কাঁবা শরিফের তাওয়াফ করাকালে হাজরে আসওয়াদ ও কাঁবা শরিফের দরওয়াজার মধ্যবর্তী স্থান, যা মিনিটের মধ্যে অতিক্রম করিতে পারে—এই সামান্য স্থান অতিক্রম করিতে পূর্ণ কোরআন শরিফ খত্ম করিয়াছেন।”

চতুর্দশ শতাব্দীর সুপ্রসিদ্ধ আলেম দেওবন্দ মাদ্রাসার মুহাদ্দেস মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (র.)-এর বোখারী শরিফের ব্যাখ্যা ফযুয়ুল বারী ৪-৯৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে, সুফিকুল শিরোমনি শেখ সাহাবুদ্দিন সোহরাওয়ার্দী (র.) একদিন এক রাত্রে ষাট (৬০) বার কোরআন শরিফ খত্ম করিতেন এবং দিল্লীর শাহ ইসমাইল (র.) আসর হইতে মাগরিব পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ধীর স্থিরতার সহিত কোরআন শরিফ খত্ম

করিতেন।”

“কোরআন হাদিসের অসংখ্য প্রমাণাদিতে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রসিদ্ধ মেরাজ শরিফের ঘটনা উক্ত ব্যবস্থার মাধ্যমে সম্পন্ন হইয়াছিল, স্বপ্ন ছিল না।” হয়রত গাউসুল আয়ম মাইজভাওরী (ক.) এবং হয়রত আমানত শাহ (র.)-এর যে ঘটনাবলী এ নিবন্ধে বর্ণিত হয়েছে সেগুলো একেবারে আধুনিক কালের ঘটনা। যা প্রকাশ্য দিবালোকে শত শত মানুষের জ্ঞাতসারে সংঘটিত হয়েছে। আল্লাহর সৃষ্টির রহস্য ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হচ্ছে বৈজ্ঞানিক ও আধ্যাত্মিক কায়দায়। পদার্থ বিজ্ঞানের উন্নয়নে সাধনা মানুষের কাছে মখলুকাতের বহু রহস্য উদ্ঘাটিত করতে থাকবে। মানুষের দরকার যথার্থ মানুষ হওয়া। মানুষের মস্তিষ্কে ও শরীরে আল্লাহ কী চেতনা ও শক্তি ডেলিগেট করেছেন, তা চিহ্নিত করতে পারলে মানুষ যে পৃথিবীতে আল্লাহর খলিফা বা প্রতিনিধি, তা সম্যক প্রমাণিত হবে।

## সুফি উদ্ধৃতি

- যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, দুনিয়ার যাবতীয় বস্তু তাকে ভয় করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে না, সে দুনিয়ার সকল বস্তুকে ভয় করে থাকে।
  - যার ভিতর যে পরিমাণ খোদাতন্ত্র জ্ঞান রয়েছে, সে খোদাকে সে পরিমাণ ভয় করে থাকে। আর আখেরাতের প্রতি যার যতটুকু অনুরাগ সে দুনিয়ায় সে পরিমাণই বর্জন করে থাকে।
  - দুনিয়ার আসক্তিমূলক কোন কাজ আরম্ভ করা খুবই সহজ, কিন্তু তা নির্বাহ করা এবং তা থেকে মুক্তি পাওয়া খুবই কঠিন।
  - মনে রেখ! যে ব্যক্তি আখেরাতের জন্য কোন সম্বল অর্জন করল না তাকে দুনিয়ার কোন সম্পদ দেওয়া হয় না। দুনিয়াতে তুমি যা উপর্যুক্ত করছ আখেরাতেও তুমি তাই পাবে। এখন তোমার ইচ্ছা বেশীও উপার্যুক্ত করতে পার আবার কমও উপার্যুক্ত করতে পার।
  - যে ব্যক্তি নিজেকে সম্মানিত বলে মনে করে, সে বিনয়কর্ম মহামূল্য নেয়ামত হতে বাস্তিত হয়।
  - যে ব্যক্তি আল্লাহতা'য়ালাকে চেনার মত চিনেছে, সে ব্যক্তি আল্লাহতা'য়ালার ইবাদত যেমন করা উচিত তেমন করতে পারে। আর আল্লাহ ভিন্ন দুনিয়ার কারো সাহায্যের মুখাপেক্ষী না হওয়াই প্রকৃত বীরত্ব।
- হয়রত আবু আলী ফুয়াইল ইবন আয়ায (রহ.)

# উচ্চুল মু'মিনিন হ্যরত হাফসা রাসূলুল্লাহ তা'আলা আনহা

## ● মো: গোলাম রসুল ●

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর এবং সমস্ত দরুদ ও সালাম হ্যরত মুহাম্মদ (দ.)-এর প্রতি আল্লাহতা'আলা বিশ্ববী সালুল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমেই দীনকে পূর্ণতা দেন। এরপর আল্লাহ দীনের দাওয়াতের দায়িত্বকে উচ্চতে মুহাম্মদীর উপর অর্পণ করেন। এ ব্যাপারে আল্লাহর সরাসরি হৃকুম হলো, তোমরাই শ্রেষ্ঠ উচ্চত, মানবজাতির কল্যাণের জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে; তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দান কর, অসৎ কাজে নিষেধ কর এবং আল্লাহর উপর বিশ্বাস কর। (সূরা আলে ইমরান-১১০)। বলুন (হে নবী) এটাই আমার পথ, (মানুষকে) আমি সজ্ঞানে আল্লাহর দিকে ডাকি এবং আমার অনুসারীরাও। (সূরা ইউসুফ-১০৮)

সাহাবাদের মধ্যে পুরুষও আছে এবং মহিলাও আছেন। তাঁদের সম্পর্কে আল্লাহতা'আলা কোরআন শরিফে উল্লেখ করেন যে, “আল্লাহতা'আলা অতি উৎকৃষ্ট বাণী নাযিল করিয়াছেন, উহা এমন গ্রন্থ যে, পরম্পর সামঞ্জস্যশীল, বার বার বর্ণিত হয়েছে, যার কারণে স্বীয় রবের ভয়ে ভীত লোকদের দেহ প্রকস্পিত হয়, অতঃপর তাদের দেহ ও অন্তর কোমল হয়ে আল্লাহর যিকিরের প্রতি মনোনিবেশকারী হয়ে পড়ে, এটা আল্লাহতা'আলার হেদায়াত, তিনি যাকে ইচ্ছা এটা দ্বারা হেদায়াত দান করে থাকেন, আর আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার জন্য কোনো পথপ্রদর্শক নাই। (সূরা যুমার-২৩)।

### হ্যরত হাফসা (রা.)-এর পরিচয়

হ্যরত হাফসা (রা.) মহিলা সাহাবীদের অন্যতম এবং রাসূল (দ.)-এর চতুর্থ স্ত্রী ছিলেন। হ্যরত মুহাম্মদ (দ.) তৃতীয় হিয়রী সনে হ্যরত হাফসা (রা.) কে বিয়ে করেন। মক্কার প্রসিদ্ধ কোরাইশ বংশীয় লৌহ মানব, সুযোগ্য ও প্রভাবশালী নেতা এবং ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা বিশ্ব বিখ্যাত ব্যক্তি হ্যরত ওমর (রা.)-এর কন্যা ছিলেন হ্যরত হাফসা (রা.)। হ্যরত ওমর (রা.)-এর পিতার নাম ছিল খান্তাব এবং স্ত্রীর নাম ছিল হ্যরত যয়নব বিনতে মায়উন (রা.)। তিনি প্রসিদ্ধ সাহাবী হ্যরত ওসমান ইবনে মায়উন (রা.) এর সহোদরা ভগী ছিলেন। হ্যরত ওমর (রা.) যেমন আরব দেশের জ্ঞানী, গুণী ও যোগ্য পুরুষদের মধ্যে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ছিলেন। তাঁর স্ত্রী যয়নব বিনতে মায়উনও তেমনি আরবের মহিলাগণের ভিতরে সবিশেষ সুন্দরী, গুণবত্তী এবং সুযোগ্য বলে পরিচিত ছিলেন। মানুষের গুণাবলী সম্পর্কে বাইবেলেও নিম্নরূপ উল্লেখ আছে। “ভগ! প্রথমে তোমার নিজের চোখ থেকে তঙ্গটা বের করে ফেলো, তাহলে তোমার ভাইয়ের চোখ থেকে কুটোটা বের করার জন্য স্পষ্ট দেখতে পাবে (মথি ৭:৫)।” তাহলে দেখা

যায় যে, বাইবেলেও মানুষকে সংশোধন করার জন্য তাঁগি দেওয়া হয়েছে। হ্যরত হাফসা (রা.) নিজ গুণে আরবের মহিলাগণের ভিতরে গুণ তৈরির প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতেন এবং তাঁদেরকে সংশোধনের উপদেশ দিতেন।

### জন্ম বৃত্তান্ত

উচ্চুল মুমিনীন হ্যরত হাফসা (রা.) রাসূলুল্লাহ (দ.)-এর নবুওয়াত প্রকাশের পাঁচ বছর পূর্বে কোরাইশগণ কর্তৃক কাবা ঘর মেরামত কার্য পরিচালনাকালে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। নবুয়তের ষষ্ঠ বর্ষে হ্যরত ওমর (রা.) যখন ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তাঁর পরিবার-পরিজনও ইসলামের ছায়ায় আশ্রয় নেন, তখন তাঁদের মধ্যে হ্যরত হাফসা (রা.)ও শামিল ছিলেন।

### হ্যরত হাফসা (রা.)-এর প্রথম বিয়ে

হ্যরত হাফসা (রা.) হ্যরত ওমর (রা.)-এর অতিশয় স্নেহের কল্যা ছিলেন। তিনি তাঁর কল্যাকে পরম স্নেহ ও যত্নে লালন-পালন করে মনের মত করে গড়ে তুলেছিলেন, যখন হাফসা (রা.) যৌবনে পদার্পণ করেন, পিতা-মাতা তাঁদের প্রাণাধিক প্রিয় কল্যাকে যোগ্য পাত্রের কাছে সমর্পণ করার জন্য যোগ্য পাত্রের খোঁজে আত্মনিয়োগ করেন। যোগ্য-অযোগ্য বহু পাত্রের সন্ধান মিলল। দেখে-শুনে অবশ্যে এক শুভ দিনে খুনায়স ইবনে হ্যাফা (রা.)-নামক এক সাহাবীর সাথে তাঁর বিয়ে হয়। নব-দম্পত্তি পরমানন্দে সংসার যাত্রা শুরু করেন। এরা স্বামী-স্ত্রী একই সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় হিয়রত করেছিলেন। হ্যরত খুনায়স (রা.) ইসলামের জন্য আত্মোৎসর্গকারীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (দ.) এর সাথে বদরের যুদ্ধে শারিক হন। তৃতীয় হিয়রত ওহোদ যুদ্ধে মারাত্মকভাবে আহত হয়ে মদীনা শরিফে প্রত্যাগমনের পর তিনি শাহাদাতের সৌভাগ্য অর্জন করেন। যার ফলে হ্যরত হাফসা (রা.) নিঃসন্তান অবস্থায় বিধবা হলেন।

### রাসূল (দ.)-এর সাথে হাফসা (রা.)-এর দ্বিতীয় বিয়ে

হ্যরত হাফসা (রা.) বিধবা হওয়ার পর তাঁর পিতা লৌহ-মানব হ্যরত ওমর (রা.) উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। কারণ তাঁর মেয়ে খুবই সুন্দরী ও সুযোগ্য ছিলেন। তাই বিভিন্ন জায়গা থেকে তাঁর বিয়ের প্রস্তাব আসতে থাকে। কিন্তু হ্যরত ওমর (রা.)-এর মনোপূর্ত হয় না। এ সময় হ্যরত ওসমান (রা.)-এর স্ত্রী রোকাইয়া ইন্তিকাল করেন। তখন হ্যরত ওমর (রা.) হাফসা (রা.) কে হ্যরত ওসমান (রা.)-এর সাথে বিয়ে দেওয়ার জন্য প্রস্তাব করেন। রাসূল (দ.)-এর কন্যা রোকাইয়া

ইন্তিকাল করলেও হ্যরত ওসমান (রা.) হ্যরত হাফসা (রা.) কে বিয়ে করতে রাজী হন নাই। তখন হ্যরত ওমর (রা.) তাঁর মেয়ের বিয়ে হ্যরত আবু বকর (রা.)-এর সঙ্গে দেওয়ার প্রস্তাব করেন। কিন্তু হ্যরত আবু বকর (রা.) তাতে রাজি হন নাই। এরপর হ্যরত ওমর (রা.) রাসূল (দ.)-এর নিকট গিয়ে হ্যরত হাফসা (রা.)-এর বিয়ের ব্যাপারে আসল ঘটনা খুলে বললেন, ঐসব কথা শুনে রাসূল (দ.) বললেন, “ওমর! কোন চিন্তার কারণ নেই। আল্লাহর রহমতে আমি হাফসার জন্য ওসমান অপেক্ষা উত্তম পাত্র এবং ওসমানের জন্যও হাফসা অপেক্ষা উত্তম পাত্রীর ব্যবস্থা করে রেখেছি।” কিছুদিন পরেই হ্যরত রাসূলে করিম (দ.) হ্যরত ওমর (রা.)-এর নিকট নিজের পক্ষ থেকে হ্যরত হাফসা (রা.)-এর সাথে বিয়ের প্রস্তাব প্রেরণ করলেন। হ্যরত ওমর (রা.)-এর কন্যা হাফসা (রা.) কে পরম ভাগ্যবতী মনে করে সানন্দে রাসূলুল্লাহ (দ.)-এর সাথে তাঁর বিয়ে পড়িয়ে দিলেন। রাসূলুল্লাহ (দ.)-এর কন্যা উম্মে কুলসুমের সাথে হ্যরত ওসমান (রা.)-এর বিয়ের প্রস্তাব উঠলে তিনি অত্যন্ত আনন্দের সাথে প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন এবং অবিলম্বে শুভ পরিণয় সু-সম্পন্ন হলো।

**রাসূল (দ.)-এর সাথে হাফসা (রা.)-এর দাম্পত্য জীবন**  
 হ্যরত হাফসা (রা.) প্রথম ধীশক্তি এবং জ্ঞান-বৃদ্ধির অধিকারী ছিলেন। রাসূল (দ.) তাঁর নানাবিধ যোগ্যতার পরিচয় পেয়ে তিনি যাতে আরো অধিক জ্ঞান-চর্চা এবং শিক্ষা-দীক্ষা পান তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থার সুযোগ করে দেন। একে তো লৌহ-মানবের কন্যা, অপরদিকে মহানবী (দ.)-এর স্ত্রী; তাই তাঁর মান-মর্যাদা অত্যধিক বৃদ্ধি পেল। তাঁর মেজাজ বেশ কড়া ছিল, কিন্তু হৃদয় নরম স্বত্বাবের ছিল। তাঁদের উভয়ের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি অনেক বেশি ছিল। তবুও মাঝে মধ্যে মহানবী (দ.)-এর অন্যান্য পত্নীদের সাথে রুচি ব্যবহার করতেন। সর্বশক্তিমান আল্লাহ কোরআন পাকে উল্লেখ করেন যে, “মু’মিন পুরুষ ও মু’মিন নারী পরস্পর একে অন্যের বন্ধু (কল্যাণকামী)। তাঁরা সৎ কাজে উৎসাহ দেন এবং অসৎ কাজে বারণ করেন, আর সালাত কায়েম করেন, যাকাত প্রদান করেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (দ.) আদেশ মেনে চলেন, এ সমস্ত মানুষের উপর আল্লাহ অব্যশই রহমত বর্ষণ করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতিশয় ক্ষমতাবান ও হিকমতওয়ালা। (সূরা তওবা-৭১)।”

আল্লাহ নারী-পুরুষকে একে অপরের পরিচ্ছদ বা পোশাক বলেছেন অর্থাৎ, নারী-পুরুষ একে অপরের পরিপূরক ও মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। নারী-পুরুষের সহ অবস্থানের (যার যার কর্ম ও

মর্যাদানুযায়ী) ফলেই সমাজে শান্তি কায়েম সম্ভব। এটাই ইসলামের শিক্ষা।

### হ্যরত হাফসা (রা.)-এর বৈশিষ্ট্য

উম্মুল মুমিনীন হ্যরত হাফসা (রা.)-এর চরিত্র ছিল আয়নার মত নির্মল এবং স্বচ্ছ। সত্য-সততা, দান-দক্ষিণা, সৎ সাহস এবং নিয়মানুবর্তিতা তাঁর চরিত্রের মূল বৈশিষ্ট্য ছিল। তাছাড়া ইবাদত-বন্দেগীতেও তাঁর অবস্থা ছিল অনন্য সাধারণ। তিনি সারারাত নফল নামায পড়তেন ও তাস্বীহ তাহলীলে ডুবে থাকতেন এবং দিবাভাগে সারা বছর রোয়া রাখতেন। চরিত্রে একপ গুণাবলী থাকা সত্ত্বেও তাঁর চরিত্রের ভিন্ন দিকটি ছিল কিছুটা মেজাজের উগ্রতা। হ্যরত হাফসা (রা.) সর্বমোট ষাটখানা হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি উক্ত হাদিসসমূহ রাসূলে করিম (দ.) এবং পিতা ওমর (রা.)-এর নিকট থেকে শ্রবণ করেছিলেন।

### হ্যরত হাফসা (রা.)-এর ইন্তিকাল

উম্মুল মুমিনীন হ্যরত হাফসা (রা.) আমীর মুআবিয়ার শাসনামলে হিয়রী ৪৫ সনের শাবান মাসে ইন্তিকাল করেন। এ সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর। অন্তিম মৃহূর্তের পূর্বক্ষণে তিনি তাঁর ভাতাকে ডেকে অসিয়ত করে যান যে, তাঁর ইন্তিকালের পর যেন তাঁর সমস্ত-সম্পদ আল্লাহর পথে দান করে দেওয়া হয়।

মদিনার তৎকালীন গভর্নর মারওয়ান হ্যরত হাফসা (রা.)-এর জানায়া পড়ান। হ্যরত আবু হোরায়রা (রা.)-এর তত্ত্বাবধানে কবরস্থান পর্যন্ত জানায়া নিয়ে যাওয়া হয়। হ্যরত আবদুল্লাহ (রা.) এবং হ্যরত হাময়া (রা.) কবরে নেমে তাঁকে কবরের ক্রোড়ে চিরশয়নে শায়িত করেন। মদিনার জান্নাতুল বাকীতে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। আমি হ্যরত হাফসা (রা.)-এর কবর মদিনা শরিফের জান্নাতুল বাকীতে জিয়ারত করতে পেরেছিলাম ১৯৯৬ সালে। আল্লাহ বলেন, “আমার নির্দেশনসমূহের মধ্যে একটি হলো, তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে সঙ্গনীদেরকে সৃষ্টি করেছি, যেন তোমরা তাদের থেকে শান্তি লাভ কর। আর আমি তোমাদের উভয়ের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছি। নিশ্চয়ই এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য নির্দেশনাবলী রয়েছে, (সূরা রাম-২১)।”

### সূত্র :

১. কোরআন শরিফ
২. ড. ইবনে আশরাফ, ঈমান আমল ইলম, রিমবিম প্রকাশনী, বাংলা বাজার, ঢাকা
৩. মোসাম্মাঁ আমেনা বেগম, মহিলা সাহাবী ও বেহেশ্তি রমণীগণ (১ম-৪৮ খণ্ড)
৪. নীলুফা ইয়াসমিন, জান্নাতি দশ রমণী, সিদ্ধিকীয়া পাবলিকেশনস্, বাংলা বাজার, ঢাকা

# ঈদে মিলাদুন্নবী (দ.) উদ্যাপনের সার্থকতা

## ● মুহাম্মদ ওহীদুল আলম ●

পৃথিবীর সকল মানুষ স্বভাবতই কল্যাণকামী। অন্তত সে নিজের কল্যাণ কামনা করে। কল্যাণ কামনা করে নিজ সন্তানের। আপনজনদের। যে মানুষ কল্যাণকামী, তাকে কল্যাণকর কাজই করতে হয়। হাঁটতে হয় সোজা পথে, উচ্চারণ করতে হয় সত্য বচন। তাকে হতে হয় সৎ, দয়ালু ও সহানুভূতিশীল। তাহলেই তার জীবনযাপন স্বভাবধর্মের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। কিন্তু বাস্তবে মানুষের জীবনযাপন কল্যাণের সাথে সাংঘর্ষিক। তার অনেক আচরণ স্বাভাবিকতার বিপরীত। এর কারণ কী? কারণ হচ্ছে মানুষের স্ব স্ব দৃষ্টিভঙ্গী। তার দৃষ্টি স্বকাল, স্বসমাজ, স্বদেশ, স্বজাতির সীমানায় স্বেচ্ছাবন্দী। সে মাথার ওপর সুবিশাল আকাশ দেখে, চোখের সামনে সুদূরপ্রসারী দিগন্ত দেখে, কিন্তু নিজের মনকে আকাশের মতো উদার করেনা, দৃষ্টিকে দিগন্তের ন্যায় প্রসারিত করেনা। যে নিজের জন্য যা কামনা করে অন্যের জন্য তা কামনা করেনা। সে মানুষকে ‘আমি ও আমরা’ এবং ‘সে ও তারা’ এরকম মোটাদাগে ভাগ করে নিয়েছে। কিছু মানুষ মনে করে, ‘আমি বা আমরা একটা রেখা টেনে দেব, সে রেখা বরাবর অন্যরা হাঁটবে। ডানে বললে যাবে ডানে, বামে বললে বামে, থামতে বললে থামবে, ফিরে যেতে বললে আপনি না করে ফিরে যাবে।’

কিন্তু কোনো মানুষ মনগড়াভাবে অন্য কোনো মানুষের জন্য এভাবে পথচলার রেখা এঁকে দিতে পারেনা। কারণ সে নিজে নির্বিরোধ, প্রকৃত ও চূড়ান্ত সত্যকে জানেনা। সে যা জানে তা আপেক্ষিক সত্য, যা করতে পারে তা অনুমান। সে ভবিষ্যত জানেনা, অতীত তার কাছে অস্পষ্ট, বর্তমানের সব লক্ষণ তার চোখে ধরা পড়েনা। আপেক্ষিক সত্য মিথ্যার কাছাকাছি, অনুমান হতে পারেনা সত্যের ভিত্তি। ভাবিষ্যত পুরোপুরি জানানা থাকায় তার পরিকল্পনা নিখুঁত হয়না, অস্পষ্ট অতীত থেকে সে কার্যকর শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেনা, বর্তমানের সব লক্ষণ দৃষ্টিতে ধরা না পড়ায় সে হয়ে পড়ে একদেশদর্শী। একদেশদর্শিতা মানুষকে ন্যায়পরায়ণ হতে বাধা দেয়, ইনসাফ থেকে দূরে ছিঁটকে পড়ে তার ব্যবস্থাপনা। তাই ভুল হয় তার ‘ডায়াগনোসিস’, নির্ণয় করতে পারেনা সে ‘প্রোগনোসিস’। সে কোনো ব্যাপারে নিজেকে মনে করতে পারে বিশেষজ্ঞ, কিন্তু বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সে থাকতে পারে বিশেষভাবে অজ্ঞ। সে হতে পারে রাজনৈতিক কিংবা অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী কিন্তু

নেতৃত্ব শক্তিতে প্রচণ্ডভাবে দুর্বল। ফলে শক্তির ভারসাম্য রক্ষা করতে সে পারেনা। আর ভারসাম্যহীন শক্তি কিছু মানুষকে করতে পারে বেপরোয়া আর অধিকাংশ মানুষের জীবনকে করে দিতে পারে বিপর্যস্ত।

তাই নিজের বা আপনজনের স্বভাবগত কল্যাণকামনার ফলিতরূপ সমাজে দৃষ্ট হয়না। তখন একপ্রকার দুষ্টচ্ছেন্নের আবর্তে স্বরূপাক থেতে থাকে মানুষের জীবন, ক্রমাগতভাবে সে হতে থাকে পীড়িত ও নিপীড়িত। লাগাতার এ পীড়ন ও নিপীড়ন তার জীবন থেকে কেড়ে নেয় শান্তি ও স্বষ্টি। ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগ থেকে নিম্নভাগই তার কাছে তখন অধিক প্রিয় মনে হতে থাকে।

কিন্তু ভূপৃষ্ঠের সকল আলো ও সূষ্মাকে সমভাবে উপভোগ করার অধিকার নিয়েই মানুষ পৃথিবীতে এসেছে। তাকে করা হয়েছে এক বিশেষ উদ্দেশ্যের অনুগামী, বিপুল এক সম্ভাবনার সূত্কাগার, এক পরম লক্ষ্যপালে ক্রমাগত এগিয়ে যাবার যোগ্যতাসম্পন্ন গতিধারার অধিকারী। মানুষের এ জন্মগত অধিকারকে সুনির্ণিত ও নিরাপদ করার জন্যই প্রয়োজন হয়ে পড়ে আসমানী ওহীর। মানুষসহ সকল জীব ও জীবনের তথ্য সমগ্র বিশ্বজাহানের মালিক ও স্রষ্টা মহান আল্লাহতায়ালা সে ব্যবস্থারই আঙ্গাম দিয়েছেন যুগে যুগে নবী রাসূলদের (তাঁদের সবার ওপর বর্ষিত হোক আল্লাহর আল্লাহর অবারিত শান্তি ও করুণাধারা) প্রেরণ করে ও আসমানী ওহী পাঠিয়ে। যেসব মানুষের নসীব ভালো তারা নবী রাসূলদের স্বাগত জানিয়েছেন, তাঁদের বাণীকে গ্রহণ করে ধন্য করেছেন জীবন ও যৌবন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তাঁদের থেকে পিঠ ফিরিয়ে নিয়েছে, আসমানী ওহীকে অবাস্তব ও অলীক বলে উড়িয়ে দিয়েছে। আসমানী সত্যের প্রতি তারা অবজ্ঞার হাসি হেসেছে, তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করেছে নবীদের নির্দেশ। মানুষ নিজের পিঠকে দেখতে পায়না যদিও সে প্রতি মুহূর্তে নিজের সাথে তাকে বহন করে চলে। এভাবে আসমানী ওহীর প্রতি পিঠ ফিরিয়ে সে সত্য থেকে পালিয়ে বাঁচতে চায়। কিন্তু পালিয়ে বেশিদূর যেতে পারেনা, বড়জোর ফিরাউন ও তার বাহিনীর মতো হ্যরত মুসা আলায়হিস্স সালাম ও বনী ঈসরাইলকে পাকড়াও করার জন্য নীল নদের মাঝামাঝি পর্যন্ত যেতে পারে এবং দুপাশের পানির চাপে খেই হারিয়ে বলে ওঠে, ‘আমি ঈমান আনলাম। ঈমান আনলাম মুসা ও হারুনের রবের প্রতি।’ কিন্তু ততক্ষণে অনেক

দেরি হয়ে গেছে। ফেরেশ্তার সজোরে নিষ্ক্রিয় কাদামাটিতে ভরে গেছে মুখগহ্বর, যে মুখগহ্বর আজীবন উচ্চারণ করে গেছে সত্যের প্রতি সরোষ হৃক্ষার।

কিন্তু যে মানুষ মনে করে আসমানী ওহীর প্রতি পিঠ ফিরিয়ে রাখলেই সকল বিপদ আপদ থেকে সে নিরাপদ হয়ে যাবে সে জানেনা, তার পিঠের মতোই তার দুনিয়ার জীবনকে অনুসরণ করে চলেছে অনন্ত আধিরাত। অদেখা সে পিঠের ওপর শুয়েই সে শেষ নিঃশ্বাস ছাড়ে, পাড়ি জমায় আধিরাতের পথে। অথচ পিঠের মতো আধিরাতকে চোখের সামনে দেখেনা বলেই সে তাতে অবিশ্বাস করে। আসমানী বাণী মানুষকে শুধু ভয় দেখায়নি বরং অফুরন্ত অনন্ত এক জীবনের জয়গান শুনিয়েছে। সে জয়গান অনিঃশ্বেষ ও অক্লান্তিকর আনন্দ ও শান্তি। মানুষকে আহ্বান জানিয়েছে সে জীবন ভোগ ও উপভোগ করার জন্য নিজেকে উপযুক্ত করে তুলতে। কিন্তু মানুষ যদি সে আনন্দের সংবাদকে গ্রহণ না করে উল্টো পথে ধাবিত হয় তাহলে সে যেন নিজ দায়িত্বে অনিঃশ্বেষ আগুনের দহন ঘন্টাগু ভোগ করার জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখে। এখানেই মানুষের একাধারে অনুপম শ্রেষ্ঠত্ব ও অনাস্বাদিত ঝুঁকি। কারণ নিজের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সে একেবারেই স্বাধীন। আল্লাহর সবচেয়ে স্বাধীন। তাঁর মতো স্বাধীন আর কেউ নেই। তিনি স্থান ও কালের উর্ধ্বে। কারণ যিনি কাল ও স্থান সৃষ্টি করেছেন তিনি সেগুলোর অধীনস্থ হতে পারেন না। সব সৃষ্টি তাঁর একান্ত অনুগত। তারা নিজ নিজ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অক্ষম। তারা সৃষ্টিগতভাবে আল্লাহর ভুক্ত পালনে বাধ্য ও অভ্যন্ত। মানুষ ও জীৱিজাতিই নিজের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বাধীনতা পেয়েছে। এরপরও তারা স্থান ও কালের অধীন। প্রতিনিয়তই তারা আয়ু হারায়, প্রতিনিয়তই তাদের সৌন্দর্য ক্ষয় হয়। কিন্তু প্রতিটি কল্যাণকর কথা ও কাজ প্রতিনিয়ত তার আয়ুকে সার্থক করে তোলে আর তার আত্মার সৌন্দর্যকে করে উজ্জ্বল হতে উজ্জ্বলতর। তাকে করে শাণিত প্রাণিত ও মহিমান্বিত। এ রকম আত্মার অধিকারী মানুষই আধিরাতের অফুরন্ত নিয়ামত ও সৌন্দর্য উপভোগ করার উপযোগী। এ আত্মার উদ্বোধন ঘটাতে পারে আসমানী ওহী। মানুষের আত্মা তার অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের মতো নয়। রূপচর্চার দুনিয়াবী সকল সামগ্ৰী মানুষের তুককে উজ্জ্বল করতে পারে কিন্তু আত্মার সৌন্দর্য বৰ্ধনে আসমানী ওহীই একমাত্র ও শেষ অবলম্বন। ওহীর আলো ছাড়া আত্মাকে অন্য কিছুতে আলোকিত করতে পারেনা।

আসমানী ওহীর চূড়ান্ত, আধুনিক ও সর্বসাম্প্রতিক তম রূপটি ধারণ করে আছে পৰিত্ব কুরআন। বিশ্বয়কর এ কুরআন

মানুষের প্রয়োজন ও উপযোগিতাকে সামনে রেখে দীর্ঘ তেইশ বছরে নায়িল হয়েছে। এ কিতাব যদি আপাত অটল পাহাড়ের ওপর নায়িল হতো তাহলে আল্লাহর ভয়ে তা বিনীত ও বিদীর্ণ হয়ে যেতো। কিন্তু যে মহান মানুষটির ওপর কুরআন নায়িল হয়েছে কুরআনের প্রচঙ্গ ও বিশ্বয়কর শক্তি ও তেজোদীপ্তি প্রভাবকে সহ্য ও ধারণ করার মতো ক্ষমতা মহান আল্লাহ তাঁকে দিয়েছিলেন। আল্লাহ পৰিত্ব কুরআনের শুরুতে নিজেকে ‘রব্বুল আলামীন’ হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন। আর তিনি পৰিত্ব কুরআনের বাণীবাহকের পরিচয় দিয়েছেন ‘রহমাতুল্লিল আলামীন’ হিসেবে। আল্লাহর রবুবিয়তের সীমানা জুড়ে আল্লাহর হাবীব রাসূলে করিম হয়রত মুহাম্মদ (দ.) এর রহমতের ব্যাপ্তি। রব হিসেবে আল্লাহর তুলনা যেমন আল্লাহ নিজে তেমনি সৃষ্টিতে রাসূলে করিমেরও সমকক্ষ কোনো নজির নেই। পাহাড়ের চাইতেও অটল তাঁর ধী ও ধৈর্য শক্তি। আল্লাহর পৰিত্ব বাণী কুরআনকে প্রথমেই তিনি আত্মস্থ করেছেন। তারপর তা বিতরিত হয়েছে মানুষের মাঝে। আমাদের দেশে মায়েরা যেমন তার আদরের সন্তানকে গরম পানিতে গোসল করানোর সময় নিজের হাত দিয়ে পানির উভাপ পরিমাপ করে দেখে তা কচি বাচ্চার নরম তুক সহ করতে পারবে কিনা তেমনি রাসূলে করিম (দ.) কুরআনের ঐশ্বী উভাপকে প্রথমে নিজের মধ্যে ধারণ করে নিয়ে তা মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিয়েছেন। এ কুরআন যদি সরাসরি সাধারণ মানুষের কাছে আসতো তাহলে তারা পাহাড়ের মতো গলে বিদীর্ণ হয়ে যেত। (এ বিষয়ে আল্লাহই ভালো জানেন)। কুরআনের সে উভাপ এখনো সমভাবে পৃথিবীতে মানুষের মাঝে প্রবহমান। এখনো প্রকৃত জ্ঞানী ও সমবাদার মানুষেরা কুরআনী সত্যের কাছে বিশ্বয়ে বিমৃঢ় হয়ে পড়েন। বিশ্বয়ে তাঁরা বলে ওঠেন, ‘এ কুরআন কিছুতেই মানুষের রচনা হতে পারেনা।’

বস্তুত পৃথিবীর সকল জ্ঞানী গুণী লেখকদের কলম একসাথে অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে কুরআন মাথায় থাক, কুরআনের আয়াতের মতো একটি আয়াত রচনা করতেও সক্ষম নন। তাই কুরআন নিজেই বলেছে এটি প্রজ্ঞাময় মহান আল্লাহর তরফ থেকেই এসেছে। মানুষের জন্য সতর্কবাণী ও সুসংবাদরূপে। আবহমানকাল হতে নায়িলকৃত আল্লাহর আদেশ ও নিষেধের সারসংক্ষেপ ও সমন্বিতরূপ হচ্ছে কুরআন। কুরআন সংরক্ষণের দায়িত্ব আল্লাহ স্বয়ং গ্রহণ করেছেন। পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবগুলো অতি বুদ্ধিমান কিংবা বুদ্ধিভুষ্ট মানুষের হস্তক্ষেপের ফলে বিকৃত হয়ে পড়েছে। কিন্তু আল্লাহর

আদেশের মধ্যে কোনো হেরফের হয়না। মানুষ যাতে জীবনযাপনে সঠিক দিশা পায় তার জন্যই কুরআনের আবির্ভাব।

কুরআন কোনো বিশেষ জাতি বা গোষ্ঠীর জন্য নায়িল হয়নি। সমগ্র মানবজাতিই এর লক্ষ্যস্থল। তেমনিভাবে কুরআনের বাণীবাহক হ্যরত মুহাম্মদ (দ.) পুরো মানবগোষ্ঠীর নবী। তিনি একদিকে মানুষের কাছে আল্লাহর প্রতিনিধি আবার আল্লাহর কাছে মানুষের প্রতিনিধি। তাঁর অন্যতম কৃতিত্ব এই যে, তিনি কুরআনকে খিওরির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেন নি। কুরআনের চাহিদা অনুযায়ী তিনি একটি প্রতিনিধিত্বশীল রাষ্ট্র গঠন করে কুরআনী আদেশ নিষেধের বাস্তবরূপ স্বীয় জীবন্দশায় দিয়ে গেছেন। আগেই বলা হয়েছে তেইশ বছর ধরে কুরআন নায়িল হয়েছে। এ তেইশ বছর তিনি ও তাঁর সহযোগীরা অবর্ণনীয় দুঃখকষ্ট ভোগ করেছেন। অপরিণত বুদ্ধির অধিকারী ও জ্ঞানপাপীরা পদে পদে তাঁর জন্য বাধার পাহাড় সৃষ্টি করেছে। তাঁকে কঠিন কঠোর হৃদয়ের কাফিরদের নিষ্ঠুরতার শিকার হতে হয়েছে, মুনাফিক বা কপট বিশ্বাসীদের হীন ষড়যন্ত্রের মুকাবিলা করতে হয়েছে, অঘটনঘটনপটিয়সী ইহুদিদের কৃটকৌশলকে পরাজিত করতে হয়েছে। মাদানী জীবনের মাত্র দশবছরে তাঁকে ছোট বড় ৮৫টি যুদ্ধ করতে হয়েছে। মক্কী জীবনের ১৩ বছরের মধ্যে তিনি বছর তাঁকে সঙ্গী সাথীদের নিয়ে শোয়েবে আবি তালিবে নির্বাসিত জীবন যাপন করতে হয়েছে। তাঁর নিরীহ অনুসারীদের অবর্ণনীয় শারীরিক জুলুমের শিকার হতে হয়েছে। তাঁকে হত্যা করার জন্য কাফিরদের তলোয়ার বারবার ঝলসে ওঠেছে। তায়েফের ময়দানে তাঁকে কৃপমণ্ডুকদের হামলার শিকার হতে হয়েছে। এর ভেতর দিয়েই তাঁকে ওহী গ্রহণ করতে হয়েছে, আল্লাহর বাণী প্রচার করতে হয়েছে, মানুষের অভাব অভিযোগের সুরাহা করতে হয়েছে, আর্ত নিপীড়িতের সেবা করতে হয়েছে, মানুষে মানুষে ভাতৃত্ব স্থাপন করতে হয়েছে, বিদেশী রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের কাছে পত্র প্রেরণ করতে হয়েছে, ভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের অভ্যর্থনা জানাতে হয়েছে, বিরঞ্জবাদীদের অভিনব সব প্রশ্নের জবাব দিতে হয়েছে, সংসারের দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে, রাষ্ট্র গঠন ও পরিচালনা করতে হয়েছে, যুদ্ধের মাঠে সিপাহসালারের দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে, মসজিদ নির্মাণ করতে হয়েছে, নামাযে ইমামতি করতে হয়েছে, প্রথাসিদ্ধ ইবাদতের বাইরে অতিরিক্ত ইবাদত বন্দেগী করতে হয়েছে, মানুষকে উপদেশ দিতে হয়েছে, ঘুরতে হয়েছে অলিতে গলিতে, প্রতিটি জনপদে, বাজারে ও জনসমাবেশস্থলে, বিরোধ নিরসনে বিচার মীমাংসা

করতে হয়েছে, মানুষে মানুষে, গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে সজ্ঞাব স্থাপন করতে হয়েছে, মানুষের রাখা আমানত সংরক্ষণ করতে হয়েছে, যথাসময়ে তা হকদারদের কাছে পৌছাতে হয়েছে। এর মধ্যে তাঁকে চুক্তির পর চুক্তি সম্পাদন করতে হয়েছে, রাষ্ট্রীয় সংবিধান (মদিনা সনদ) রচনা করতে হয়েছে। এতদসত্ত্বেও কখনো তাঁকে মিথ্যা বচন উচ্চারণ করতে দেখা যায়নি, শোনা যায়নি অশুন্দ উচ্চারণ কিংবা অবিশুন্দ ভাষায় কথা বলতে, দেখা যায়নি কাউকে প্রদত্ত কোনো ওয়াদা খেলাপ করতে। মানবীয় কোনো গুণের অভাব ছিল না তাঁর, অতিপ্রাকৃতিকতার ভান ছিল না, গান্ধীর্য তাঁকে কখনো ছেড়ে যায়নি, কিন্তু কোনো বাদশাহী চাল ছিল না অথচ হাস্যরসেও ছিলেন পারঙ্গম। মানুষ তাঁকে একান্ত আপনজন ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে অভ্যন্ত ছিল না অথচ সবসময় তাদের স্মরণে জাগরুক থাকত তিনি আল্লাহর রাসূল। তাঁর প্রতিটি কথা, উচ্চারণ ছিল স্পষ্ট, যা দূরবর্তী শ্রোতার পক্ষেও কষ্ট হতোনা বুঝতে। তাঁর কথার বিন্দুর মধ্যে ছিল সিদ্ধুর গভীরতা। তাঁর সাধারণ কথার মধ্যেও ছিল ব্যাপক অর্থবোধকতা ও অর্থদ্যোতনা। ছিলেন তিনি মনোযোগী শ্রোতা, সাবলীল বক্তা। তাঁকে ভালো না বাসার, শ্রদ্ধা না করার সাধ্য ছিল কার?

তথাপি কিছু বদনসীব মানুষ তাঁর বাণীকে গ্রহণ করেনি তখন, এখনোও যেমন অনেকেই আছে তাঁর নিন্দায় বিভোর। আসলে তারা আল্লাহর বাণীকেই অগ্রাহ্য করতে অগ্রণী, কারণ তিনিতো কখনো ভিন্ন কথা বলেননি আল্লাহর অভিপ্রায়কে প্রকাশ করা ছাড়া। তাই যারা মুহাম্মদ (দ.) থেকে যত দূরে তারা আল্লাহ হতেও ততদূরে। যে মুহাম্মদ (দ.)কে শক্রজ্ঞান করে আল্লাহ কখনো তার বন্ধু হতে পারেন না। বস্তুত রাসূলে করিম (দ.) এর গোটা জিনেগী ছিল কুরআনের বাস্তব প্রতিফলন। তিনি ছিলেন প্র্যাকটিক্যাল কুরআন। কিতাব হিসেবে কুরআন আবির্ভাবের ৪০ বছর পূর্বে দুনিয়ায় এসেছিলেন এ প্র্যাকটিক্যাল কুরআন। আর তিনিতো নবী ছিলেন তখনও যখন হ্যরত আদম আলাইহিস সালাম ছিলেন মাটি ও পানিতে একীভূত হয়ে। আল্লাহ ও মানুষের কাছে তাই তিনি অনন্য এক মর্যাদায় ভাস্বর।

কুরআনকে যারা গাইডবুক হিসেবে মানতে আগ্রহী মুহাম্মদ (দ.)কে অধ্যয়ন করা ছাড়া তাদের গত্যন্তর নেই। ১২ই রবিউল আউয়াল ঈদে মিলাদুল্লাহী উদ্যাপন করার সার্থকতা এখানেই।

# ইউসুফে সানী বেলাশক বু-দ দর আখের যামা : বাবা ভাণ্ডারী কেবলা আলম

## ● আলোকধারা ডেঙ্ক ●

বাবা ভাণ্ডারী কেবলা আলম সম্পর্কে ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজহিদে আয়ম, আশিকে রাসূল (দ.) আল্লামা গাজী সৈয�়দ মুহাম্মদ আজিজুল হক শেরে বাংলা (রহ.) লিখেছেন, “বাহরে সা-নি গাউসুল আয়ম শা-হ গোলাম রহমানে মা-/ মারহাবা-সদ মারহাবা-সদ মারহাবা-সদ মারহাবা-/ উ-গুলে-অ্য বা-গে আঁ-শা-হ আহমদ-হ বে-গুমা’/ বা-খেত্তাবে বাবাজান কেবলা শুদ্ধাহ মাশভুর দা’/-গশ্ত মাইজভাণ্ডার আয় আঁ-জা-সাজদা গা-হে ‘আশিকু’/- বু- য়ে-আঁ-গুল করদাহ শায়দা-সা-ইরে আহলে জাহাঁ-নূরে চুশমে আহমদ উল্লাহ গাউসুল আয়ম মারহাবা-/ বু-দ উ-মাজযুবে সা-লেক দরমিয়া-নে আউলিয়া-/ মোহরে খা-মু-শী দর আ-দম বর দাহাল খো-দ কশীদ-/ চু-যে ত্বকায়ে ফানা-ফিল্লাহ বাকা-বিল্লাহ রসী-দ মায়হারে নূ-রে খোদা উ-রা- বেদা-নী- বে-গুম্মা-/ইয়ুসুফে সা-নী বেলা-শক বু-দ দর আ-খের যামা-/মরদুম্মা-পুর ফায়্য বা-শব্দ দা-ইমান অ্য যা-তে আঁ-/ শুদ কারা-মাতশ বে-রুঁ-আ্য হদে তাহরীর ও বয়া-/ মরদুম্মা-পুর ফায়্য বা-শব্দ দা-ইমান আয় যা-তে শাঁ-/ দরমিয়া-নে ঈ-সাপু-রাস্ত, রওয়া-ই পুরনু-রে শা-.....।”

বাবা ভাণ্ডারী কেবলা আলম সম্পর্কে আল্লামা শেরে বাংলা (রহ.) এর কসিদা'র মর্মানুযায়ী স্পষ্ট করা হয়েছে যে, (১) বাবা ভাণ্ডারী হলেন গাউসুল আয়ম হ্যরত মাওলানা শাহসুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী কেবলা আলমের বাগানের বিশেষ ফুল। (২) এ ফুলের সুগন্ধি সারা বিশ্ববাসীকে মাতোয়ারা করে ফেলেছে। (৩) এ স্থান থেকে মাইজভাণ্ডার শরিফ আশেক-মন্তদের সিজদাগাহে পরিণত হয়েছে। (৪) তিনি গাউসুল আয়ম হ্যরত মাওলানা শাহসুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারীর চোখের আলো। (৫) ‘ফানা-ফিল্লাহ’, ‘বাকা-বিল্লাহ’ স্তরে উপনীত হয়ে তিনি স্বীয় জবানে নীরবতার মোহর ছেপেছেন-যা আল্লাহর রঙে রঞ্জিত হ্বার অনুপম বৈশিষ্ট্য বলে পবিত্র কোরআনে উল্লেখ আছে। (৬) তিনি আখেরি জমানার ‘দ্বিতীয় ইউসুফ’ হিসেবে প্রসিদ্ধি প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ হ্যরত ইউসুফ (আ.) এর রূপ লাভণ্য এবং অতুলনীয় সৌন্দর্য দেখে রমণীরা যেমন হৃশ-জ্ঞান হারিয়ে লেবু কাটার পরিবর্তে আঙুল কেটে রক্তাক্ত হয়ে পড়ার পরেও নিজেদের চেতনা ফিরে পান নি, তেমনি বাবা ভাণ্ডারী কেবলা আলমকে যাঁরা দেখেছেন তাঁদের অনেকে হৃশ জ্ঞান হারিয়ে বেসামাল হয়ে কখন যে সিজদাবন্ত হয়েছেন শায়েরের ভাষায় তা হচ্ছে “যা হা বেখুদীমে জুকাওঙ্গা শেরকো, ওয়াহি তুম্কো কাবা বানানা পরেগা।”

মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফের প্রতিষ্ঠাতা প্রাণপুরূষ গাউসুল আয়ম হ্যরত মাওলানা শাহসুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী কেবলা আলমের আধ্যাত্মিক বাগানের অনন্য ‘গুলে গোলাপ’ হ্যরত মাওলানা শাহসুফি সৈয়দ গোলামুর রহমান বাবা ভাণ্ডারী কেবলা আলমের হাল সম্পর্কে ইঙ্গিতময় বর্ণনা দিয়েছেন গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী'র (ক.) ভাষায়, “ওহে সাহেবে জালাল হ্যায়, মূলকে ইয়েমেন মে রাহতা হ্যায়।” অর্থাৎ তাঁর হাল ‘জালাল’

(রূপশিখা)। তিনি মূলকে ইয়েমেনে (বহু দূরে) অবস্থান করেন।’ আউলিয়া কেরামের জালাল হাল সম্পর্কে হ্যরত শায়খ আহমদ ইবনে আবুল হাসান রেফাই (রহ.) এর বর্ণনায় নুয়হাতুল বাসাতীত গ্রন্থে দেখা যায়, “যে ব্যক্তির উপর তাঁর (আল্লাহর) জালাল (রূপ শিখা) উন্মুক্ত হয় এবং দু-এক সেকেন্ড পরে পর্দাবৃত্ত করে দেয়া হয় সে ব্যক্তিই যত্নক-শওক ওয়ালা হয়ে থাকে। আর যার অন্তরে সেই রূপশিখা দু-এক ঘণ্টা পর্যন্ত উন্মুক্ত থাকে সে ব্যক্তি সত্যিকারের পানকারী হয়ে থাকে। আর এ অবস্থা যার উপর অনবরত প্রকাশ পেতে থাকে, মহবতের শরাব সে স্থায়ীভাবে পান করতে থাকে। এমনকি, তার রংগে রংগে এবং জোড়ায়-জোড়ায় আনওয়ারে ইলাহীতে পূর্ণ হয়ে যায়। তখন তাঁর এ অবস্থাকে তত্ত্বির অবস্থা বলা হয়। কখনও কখনও এরূপ অবস্থার ব্যক্তি, সকল প্রকার অনুভবনীয় এবং বোধ্য বস্তুসমূহ হতে গায়েব হয়ে যায়। সে তখন মালুম করতে পারে না, তাকে কে কি বলল এবং সেই বা কাকে কি বলল। এ অবস্থার নাম ‘শুকর’ অর্থাৎ আত্মহারা অবস্থা। আবার কোন কোন সময় শরাবে মহবতের পেয়ালা একের পর এক ঘূরে আসতেই থাকে এবং অবস্থাও পরিবর্তিত হতে থাকে। তখন সে ব্যক্তি যিকির-ফিকির ও ইবাদতের প্রতি মনোনিবেশ করতে থাকে। অবস্থার পরিবর্তন সত্ত্বেও তার সিফাতের পরিবর্তন হয় না। এ অবস্থাকে সজ্ঞানের অবস্থা বলা হয়। এ অবস্থাকে দৃষ্টির প্রসারতার যমানা এবং এলমের তারাকীর যমানাও বলা হয়। এ সমস্ত লোক এলমের নক্ষত্র হতে এবং তাওহীদের চন্দ্র হতে রাত্রিকালে হেদায়াতের আলো পেয়ে থাকে। আর মা'রেফাতের সূর্য হতে দিনের বেলায় আলো গ্রহণ করে থাকে। এরাই আল্লাহ পাকের ‘জামাআত’ নামে অভিহিত। এরাই আল্লাহ পাকের সফলকাম দল।” উন্মুক্ত বিবরণীর আলোকে বাবা ভাণ্ডারী কেবলা আলমের পদর্মাদা নির্ধারিত আছে।

বাবা ভাণ্ডারী কেবলা আলম জীবনের শেষ তেইশ বছর প্রচণ্ড নীরবতা এবং নির্বাকতা অবলম্বন করেছেন। নির্বাকতা মহান আল্লাহর অনন্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত গুণ। এটি মহান স্মষ্টার এক অপরূপ সৌন্দর্য এবং স্মষ্টা রঙ হিসেবে পবিত্র কোরআনে বর্ণিত আছে। আল্লাহ মানুষকে এ রঙ ধারণের জন্যে নির্দেশ দিয়েছেন। মানুষের পক্ষে স্বেচ্ছায় এ রঙ ধারণ করা সম্ভব হয় না। শুধুমাত্র আল্লাহর বিশেষ মেহেরবাণীপ্রাপ্ত প্রিয়তম বান্দারাই এ রঙ ধারণে সফলকাম হন। বাবা ভাণ্ডারী স্মষ্টার পরম সান্নিধ্যে এ রঙ ধারণ করেছেন এ ধারায় তিনি মাহবুবে ইলাহী পদবীতে বিভূষিত হয়েছেন। তাঁর ইউসুফী সুরতের অপরূপ সৌন্দর্য এবং নির্বাক জীবন ধারা দর্শনে আগম্ভৃক মাত্র বিমোহিত হয়ে উথাল-পাথাল হয়ে পড়তেন। দর্শকরা অনুভব করতেন ঐশ্বী পরশে নিত্যানন্দ। এটি মাইজভাণ্ডারীয়া তুরিকায় তাঁর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে দিয়েছে। ২৯ আশ্বিন পবিত্র খোশরোজ দিবসে আমরা তাঁর প্রতি শন্দা নিবেদন করছি। কামনা করছি পরম করুণাময়ের মেহেরবাণী।

# মানবজীবনে পরিশুদ্ধি অর্জনে আউলাদে রাসূল (দ.)

## শাহানশাহ সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাওরী'র জীবনাদর্শ

### ● মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম ●

মানুষ মহান স্তুর সৃষ্টিতে সর্বোত্তম গঠনে সৃষ্টি সর্বশ্রেষ্ঠ জীব। কিন্তু চারিত্রিক পরিশুদ্ধির অভাব দেখা দিলে তখন এই মানুষই পতিত হয় নিকৃষ্টতম স্তরে। পবিত্র কুরআনের সূরা তীনের পাঁচ নম্বর আয়াত যার ইঙ্গিতবাহক।

আর এই চারিত্রিক পরিশুদ্ধি বা বিশুদ্ধতা বলতে বুবায়, ব্যক্তির সত্ত্ব-অন্তরকে উত্তমরূপে পরিষ্কার করা। এর গুরুত্ব অনুধাবনে মহান রাবুল আলামিন পবিত্র কুরআনের অন্যত্র ইরশাদ করেন, “কুদ আফলাহা মান যাকাহা; ওয়াকুদ খ-বা মান দাস্সা-হা।” অর্থাৎ যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করে, সেই সফলকাম হবে। আর যে নিজেকে কলুষিত করে, সে হবে ব্যর্থ”-(সূরা শাম্স : ৯, ১০)।

বর্তমান বিশ্বে লোভী, প্রতারক, অবৈধ ব্যবসায়ী, ক্ষমতার অপব্যবহারকারী ইত্যাদি এক কথায় অপরিশুদ্ধ মানুষের আনাগোনা যেন জ্যামিতিক হারে বেড়ে চলেছে। কর্তৃপক্ষীয় মহল তা বিভিন্নভাবে দমন করার চেষ্টা অব্যাহত রাখলেও বস্তুত তা আশানুরূপ ফলপ্রসূ হয়ে উঠেনা। কারণ মানুষের চরিত্রের উপর তো আর দ্বিতীয় কারও কর্তৃত চলেনা। প্রশ্ন হতে পারে, তাহলে স্তুর পক্ষ থেকে চারিত্রিক সংশোধন ও পরিবর্তনের পছা কি? মহান স্তুর শুধু মানুষ সৃষ্টি করেই ক্ষান্ত হননি বরং ‘কোন পথ বাস্তবতার পথ, কোন পথ অনুসরণ করলে তাঁর সন্তুষ্টি হাসিল হবে- সেই পথ ও পথপ্রদর্শকও প্রেরণ করেছেন আমাদের মাঝে। এ জন্যে মহান আল্লাহ যুগে যুগে অসংখ্য পবিত্র মহাপুরুষ নবী-রাসূল, গাউস-কুতুব, অলি-আবদাল ইত্যাদি প্রেরণ করেছেন এহেন পথপ্রদর্শক রূপেই। আর তাঁদের অনুস্ত, বাতলানো পথই সেই মুক্তির পথ। পবিত্র কুরআনের ভাষায়- ‘সিরাতুল মুস্তাকিম’।

সুফি কবি যথার্থই বলেছেন,

“যুগে যুগে তুমি বিভিন্ন প্রদেশে  
নবী-অলি নামে মুনি-ঝৰি বেশে,  
ঘোর অন্ধকার হতে তুমি মানবীকে  
আলোতে টানিয়া আন।”

অসৎ কাজে লিঙ্গ হওয়ার কারণে ধীরে ধীরে মানুষের অন্তর আঁধারির পর্দায় আচ্ছাদিত হয়ে যায়। ফলে তার অন্তর্লোক অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। বুখারি শরিফের ভাষ্য মতে- “নিশ্চয়

শরীরে গোশতের এমন একটি টুকরো রয়েছে, যা সংশোধিত হলে সমস্ত অঙ্গ সংশোধিত হয়ে যায়। আর নষ্ট হলে সমস্ত অঙ্গ নষ্ট হয়ে যায়। সাবধান! সেই টুকরো হলো ‘কুলব বা অন্তর’।” আগেই উল্লেখিত হয়েছে, আল্লাহ রাবুল আলামিন মানুষের চরিত্র ও অন্তরকে মন্দ কর্মপ্রবণতা থেকে পরিশুদ্ধ করতে বা সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে গড়ে তুলতে নবী-রাসূল, গাউস-কুতুব, অলিউল্লাহকে উত্তম শোধনাগারের গুরু দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেন। ফলত তাঁরা তাঁদের অমূল্য জীবনকে উৎসর্গ করত রাবুল আলামিন প্রদত্ত দায়িত্বে ব্রতী হন। আর এমনই অসংখ্য মহাপুরুষ আমাদের চারপাশে নানা বেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছেন। তাঁদের কাউকে আমরা চিনি অথবা চিনি না। কেউ প্রয়োজনবশত প্রকাশ্যে আবার কেউ অপ্রকাশ্যে যথারীতি সৃষ্টিকর্তার প্রতিনিধিত্ব করে যাচ্ছেন। আর তাঁদেরই মধ্যকার একজন অনন্য প্রতিনিধি হলেন, আউলাদে রাসূল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়ালিহি ওয়াসাল্লাম, বিশ্বালি শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাওরী (ক.)। যিনি তাঁর উপর অর্পিত গুরু দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে সমাজে মানবজীবনের বিভিন্ন স্তরে বিচরণ করেছেন। সুইপার থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় সর্বোচ্চ ক্ষমতাসীন ব্যক্তিত্বের জন্যে তাঁর জীবনে রয়েছে পরিশুদ্ধ হওয়ার পথনির্দেশনা। যার দরুণ তিনি সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন অসংখ্য পরিশুদ্ধ মানুষ। তাঁর এ প্রতিনিধিত্ব অর্জন করতে গিয়ে তাঁকে স্বীকার করতে হয়েছে ‘অবগ্ননীয় ত্যাগ’।

১৯৫৪ থেকে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ৩৪ বছরের মধ্যে তিনি একটি রাতও ঘুমিয়ে কাটানোর সময় পাননি। সারারাত বিনিউ কাটিয়ে সকালে সামান্য সময় বিশ্রাম নিতেন। তিনি বাংলাদেশের পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, সাগর, শহর-নগরের সর্বত্র ঘূরে বেড়াতেন। প্রয়োজন হেতু সেই শুন্দি ভ্রমণ থেকে বাদ যায়নি ভারতের আগরতলা থেকে শুরু করে কিছু অংশও। স্থান-কাল-পাত্রভেদে নানা রকম হাল-অবস্থা প্রকাশ পেত তাঁর নিকট থেকে। কাউকে ভয় দেখাতেন; কাউকে প্রহার করতেন; অনেককে সালাম করার সুযোগও না দিয়ে তাড়িয়ে দিতেন। কারও প্রিয় বস্তু চেয়ে নিতেন এবং অন্যকে দিয়ে দিতেন। কারও নিকট থেকে টাকা চাইতেও দেখা গিয়েছিল। যিনি কিনা

একসাথে লাখের উপরে টাকা পুড়ে ফেলতেন বা ছিঁড়ে ফেলতেন। এ প্রসঙ্গে কুলাল পাড়ার রাজা মি.এওয়ার প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, “এগুলো হারামের টাকা। তাই পুড়তে হয়; ছিঁড়তে হয়। ওসব তুমি বুঝবে না।” অন্য একজন টাকা কুঁড়িয়ে নিতে চাইলে বলেন, “এ টাকা আপনার নয়, আল্লাহর টাকা। আপনার কী টাকা? বুঝতে চেষ্টা করুন, নতুবা আমি মারবো।” আল্লাহর নবী-অলিরা কত বিচ্ছিন্ন পছায় (হিকমত-কৌশল) মানুষকে পরিশুদ্ধির দাওয়াত দেন, পরিশুদ্ধি করেন; মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ববোধ সৃষ্টি করেন- তার ইয়ত্ব নেই।

পার্থিব কোন কিছুর প্রতি শাহানশাহ মাইজভাণ্ডারীর কোন আকর্ষণ ছিল না। এমনকি শেষ পর্যন্ত তাঁর নিজের থাকার ঘরের নির্মাণ কাজটিও অসম্ভাষ্ট থেকে যায়। অথচ তিনি কত টাকা পুড়েছেন; ছিঁড়েছেন; মানুষকে দিয়ে দিয়েছেন। লোভ, অত্যাচার, স্বার্থপ্রতায় জর্জরিত সমাজটাকে ভেঙে একটি আদর্শিক, নীতিবান ও মানুষের বাসোপযোগী সমাজে পরিণত করতে সচেষ্ট থেকেছেন। তিনি মানুষকে আপন করে নিয়েছেন, ভালোবাসা শিখিয়েছেন। চরিত্রের উচ্চতর স্তরে আরোহন করিয়েছেন। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়- পদশক্তির চেয়ে মানুষের চরিত্র অধিকতর মহাশক্তিধর। সচরিত্র ও নৈতিকতা চর্চার মাধ্যমেই মানুষের মনকে জয় করা যায়; অন্তর্বলে নয়। রাব্বুল আলামিনের প্রেরিত মহাপুরুষ, শোধনাগার বিশ্বালি শাহানশাহ হ্যরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী উত্তম, নির্মোহ, অনুপম, নৈব্যক্তিক চরিত্রের অধিকারী ছিলেন বলেই তিনি অসংখ্য পবিত্র বা সিদ্ধ মানুষ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। অসংখ্য অশুদ্ধ, অপবিত্র মানুষ তার জীবনাদর্শকে অনুসরণ করে পরিশুদ্ধ মানুষ তথা আশরাফুল মাখলুকাত রূপে ক্লিপান্টরিত হচ্ছে প্রতিটি মূহর্তে। মওলা চান তো- নিয়ে ক্ষুদ্র কলেবরে মানবজীবনের নানা দিকের আলোকে আউলাদে রাসূল (দ.), বিশ্বালি শাহানশাহ হ্যরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর জীবনাদর্শকে আপনাদের খেদমতে উপস্থাপন করার প্রয়াস চালাতে চাই।

### বাবা-মায়ের আদর্শ সন্তান

আউলাদে রাসূল (দ.), বিশ্বালি শাহানশাহ হ্যরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী একটি আদর্শবান ও জগদ্ধিক্যাত অলিউল্লাহর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। এহেন পরিবারের উত্তরসূরি, তার উপর পরিবারের বড় ছেলে হওয়ার দরুণ এই শিশুও আদর্শবান হওয়া বাঞ্ছনীয়।

যথারীতি ছেলে তাঁর উত্তম আচার-ব্যবহার, আদর্শ-আখলাক,

বুৰা-ব্যবস্থা, শিক্ষা-দীক্ষায় পরিবারে ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছেনও বটে। হয়েছেন বাবা-মায়ের কাঙ্ক্ষিত ধন। পৃথিবীর প্রত্যেক বাবা-মায়ের স্বপ্ন থাকে তাঁদের ছেলে নিজ পায়ে প্রতিষ্ঠিত হোক; পরিবার, সমাজ তথা জাতির অনুসরণীয় ছেলে হিসেবে গড়ে উঠুক। আর তিনি নিজের পায়ে নিজে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বাবা-মায়ের সেই স্বপ্নও পূরণ করেছেন। প্রসঙ্গত তাঁর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ঘটনাটি ইতিহাস থেকে নেওয়া যেতে পারে- বাবা অহিয়ে গাউসুল আয়ম হ্যরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী এক জরুরি বিজ্ঞপ্তিতে বলেন, “আমার বড় পুত্র সৈয়দ জিয়াউল হককে স্বীয় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রওজা শরিফ পুকুরের পূর্বদিকে বাগানবাড়িতে দুই কক্ষ বিশিষ্ট পাকাগৃহ, সেনিটারী ল্যাট্রিন ইত্যাদির সুব্যবস্থা করত পৃথক বসবাসের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছি এবং তিনি নিজ অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত।”

হ্যরত সৈয়দ নুরুল বখতেয়ার শাহ সাহেবকে হ্যরত গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী একরাতে স্বপ্নে বলেন, “তুমি আমার জিয়াউল হক মিয়ার সেখানে বাতি জ্বালাও; তাঁর বিকাশের সঙ্গে তুমিও রওশন হবে।” এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বাবা হ্যরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী বলেন, “আমার বড় মিয়ার কাজকর্মের এন্টেজামের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য এটা মুনিবের আদেশ। বড় মিয়া মাসুম-বেগুনাহু, দুনিয়াদারীর খবর রাখে না। লোকের নিকট তাঁর গুণগান করবে। দরবারের ভক্ত তোমার ঘনিষ্ঠ লোকজন নিয়ে তথায় খেদমতের কার্যাদি দেখবে।” বড় মিয়া কামেল কি-না এমন প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে তিনি সৈয়দ নুরুল বখতেয়ার সাহেবকে বলেন, “বড় মিয়া কামেল কি-না তা কি তুমি দেখতে চাও? তাহলে আজ রাতে হ্যরত গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারীর রওজা শরিফে ঘুমাবে; কিছু দেখলে সকালে আমাকে বলবে।” যথারীতি তিনি ঘুমালে স্বপ্নে দেখেন, “হ্যরত গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারীর রওজা শরিফ মাঝখানে দুভাগ হয়ে নিচের দিকে একখানা সিঁড়ি নেমে গিয়েছে। অতঃপর সেই সিঁড়ি দিয়ে প্রথমে উঠে আসেন বড় মিয়া শাহানশাহ হ্যরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী। তিনি সিঁড়ি সোজাসুজি রওজামুখী হয়ে দাঁড়ান। তৎপর উঠে আসেন তাঁর পিতা। তিনি রওজার একটু তফাতে পশ্চিমমুখী হয়ে দাঁড়ালেন। অতঃপর শাহানশাহ’র বুক এমনভাবে বিদীর্ণ হয়ে যায় যাতে একজন লোক অনায়াসে ঢুকে যেতে পারে। এরপর সিঁড়ি দিয়ে একের পর এক উঠে এসে সে বুকে প্রবেশ করতে লাগলেন যথাক্রমে আল্লাহর রাসূল (দ.), হ্যরত মওলা আলী (ক.), গাউসুল আয়ম দস্তগীর হ্যরত সৈয়দ আব্দুল

কাদের জিলানী (ক.), হযরত খাজা মুঁজনুদ্দীন চিশতি (ক.), গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী হযরত সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (ক.), গাউসুল আয়ম বিল বিরাসত হযরত সৈয়দ গোলামুর রহমান বাবা ভাণ্ডারী (ক.)। সকলকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে অবশ্যে তাঁর পিতা খাদেমুল ফেকারা হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) প্রবেশ করেন।”

একজন আদর্শবান ছেলে হওয়ার সত্যায়নে বাবার উপর্যুক্ত ভাষ্যই যথেষ্ট। বাবার আদর্শ-স্বপ্নের বাস্তব প্রতিফলনের এই যৎসামান্য বর্ণনার সঙ্গে মায়ের দিকটিও একটু স্মরণ করা প্রাসঙ্গিকতার দাবি রাখে। মা সাত রাজার ধন ছেলেকে নিজের মত করেই লালন-পালন, আদর-মেহ, শিক্ষা-দীক্ষা দিয়ে বড় করেছেন। মা-ছেলের পারস্পরিক ভালবাসাও ছিল বর্ণনাতীত; সুমধুর; এমনকি বর্তমান নৈতিকতার অধঃপতনের যুগে অনুসরণের দাবিদার। একদিন তিনি মাকে বলেন, “মা, আমার একটা স্যুট লাগবে।” মা নেতিবাচক বুঝ দিতে চাইলে, মায়ের গলা জড়িয়ে আবদারের স্বরে বলেন, “মা, আমি না আপনার আদরের ছেলে!” ভালবাসার এ আবেদনে মা সুন্দর একটি স্যুট বানিয়ে দেন। ছেলের কোন সমস্যা হলে মা যথারীতি তা কোনভাবেই মেনে নিতে পারতেন না। ছেলেই যেন মায়ের প্রাণ। একদিন ছেলে খাদেম হাবিবুর রহমানকে বলেন, “আমার পাণ্ডুলো টিপে দাও তো।” হাবিবুর রহমান পায়ে হাত দিতেই চমকে উঠেন; যেন বিদ্যুৎ প্রবাহ! দৌড়ে গিয়ে মাকে বলেন, “বড় দাদার সমস্ত শিরা উপশিরা উপরের দিকে কীসে যেন টানছে!” ছেলের এমন অবস্থা শুনে-দেখে মা দিশেহারা। তেল মালিশ করতে করতে কেঁদে কেঁদে তিনি হযরত গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারীর উদ্দেশ্যে আবেদন জানান, “আমার ছেলে ছেটকাল থেকে কখনো কষ্ট করে নি। আমার পিতার মতো (গাউসুল আয়ম বিল বিরাসত হযরত সৈয়দ গোলামুর রহমান মাইজভাণ্ডারী) পাহাড়-পর্বত, বন-জঙ্গলে কষ্ট করতে পারবে না। রিয়ায়ত যা কিছু করতে হয়, আমার সামনেই যেন করা হয়।” মমতাময়ী মায়ের আবেদন বৃথা যায়নি।

এই মহীয়সী মা এমন আদর্শিক ছেলে সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীকে গর্ভধারণ ও যথাযথভাবে লালন-পালন করে ইতিহাসে আজ রত্নাগর্ভা মা হিসেবে অমর হয়ে আছেন। আর ছেলেও উত্তম চরিত্র, নীতি-নৈতিকতা, আদর-আখলাক, বুঝ-ব্যবস্থা, শিক্ষা-দীক্ষা ও খেদমতে বাবা-মায়ের সন্তুষ্টি অর্জন করে অজস্র সন্তানের আদর্শ হিসেবে মহাপুরূষ হয়ে আছেন।

**স্নেহাস্পদ ভাই-বোনদের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ**

পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে আউলাদে রাসূল (দ.), বিশ্বালি শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী ছিলেন সবার বড় এবং ছয় বোনের মধ্যে চতুর্থ। ঘরের প্রথম ছেলে হিসেবে তিনি বড় তিন বোনের চোখের শীতলতার কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন। কোলে কোলে আর আদর-যত্নেই থাকত সারাদিন ভালবাসার ভাইটি। আদর-যত্নে আর ভালবাসায় ভাই-বোনদের পারস্পরিক সম্পর্কটা ছিল বর্ণনাতীত। যার সাক্ষী যেন কেবল প্রত্যক্ষদর্শীরা ও ঘটমান ক্ষণগুলো। তুলনামূলক বেশি আদর-স্নেহ কিংবা দেখাশুনা করতেন মাতৃপ্রতিম বড় বুরু। তাই মায়ের অগোচরে বুরুই একমাত্র ভরসা। শবে বরাত, শবে কদর কিংবা পরীক্ষা এলে অধিক রাত জাগতে হয়। এতে ঘুমের ঝামেলা থেকে বাঁচতে চা পান করা চাই। মাকে বললে হয়তো বকুনি দেবেন- ‘ছোট ছেলে! বেশি চা পান করা ভাল না’ বলে। ছুপি ছুপি বুরুকে ডাকতেন। যতবার প্রয়োজন বুরু চা করে দিতেন। কখনো দরদ ভরা কঢ়ে বলতেন, “বুরু তোমার সুখের সংসার হবে।” বোনদের বিবাহ হয়ে যাওয়ার পরও যথাযথ দায়িত্ব পালনে তিনি ছিলেন নিষ্ঠাবান। ভাই-বোনদের সবকিছু দেখতেন নিখুঁতভাবে। ছোট ভাই চৌদ্দ বছর বয়সী বালকের দায়িত্ববোধের বর্ণনা দিতে গিয়ে জীবনের চিরস্মরণীয় স্মৃতি বর্ণনায় বড় বুরু সৈয়দা মোবাশ্বেরা বলেন, “বোন প্রসব বেদনায় কাতর। ধাত্রী চরম মুহূর্তের অপেক্ষায়। সন্তান সন্তুষ্ট বোনের কাতরতা দেখে সেবিকারাও বেদনার্ত। বোনের এহেন অবস্থায় নিজ কক্ষ থেকে ছুটে এলেন ভাই সৈয়দ জিয়াউল হক। সেই সময়ে তাঁর করণীয় তেমন কিছুই ছিল না। তবুও সর্বক্ষণ ছটফট করতে থাকেন। সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে লোটায় পানি ভরে সামাজিক লাজ-লজ্জার কথা ভুলে গিয়ে মাথায় পানি ঢেলে তাঁকে শান্ত করেন।” একদিন দুপুরে বাড়ির সামনে খালি গরুর গাড়ি নিয়ে খেলার মনস্ত করলেন। জুটিয়ে নিলেন শিশু-কিশোরের দল। প্রস্তাব দিলেন, “আমরা দুভাগ হয়ে একদল গাড়ি টানবো, অন্যদল গাড়িতে চড়বো। ঠিক মসজিদের নিকট পৌঁছলে পালাবদল হবে।” প্রস্তাব মত তিনি টানার দলে; তাঁর মেজ ভাই মুনির চড়ার দলে। নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছলে আরোহীরা নেমে যায়। প্রথমে যাঁরা টানছিলো তাদের চড়ার পালা। ভাই নামতে চাইলে নিষেধ করলেন। মেজ ভাই বললেন, “এবার যে আপনার আরোহনের পালা।” তিনি উত্তর দেন, “তুমি ছোট তো, তুমিই থাক।” ছোট ভাই-বোনদেরকে পিতৃসম মায়া-মমতা, ভালবাসা দিয়ে আগলে রেখেছেন সারাটা জীবন। ইতিহাস নিরব চিঞ্কারে জানান দেয়- তিনি কেমন আদর্শিক ভাই ছিলেন! শহরের বাসায় ছোট ভাইয়েরা আগেই ঘুমুতেন। লেখাপড়া সেরে তিনি একটু রাত করে ঘুমুতেন।

শোবার আগে দেখতেন ভাইদের বিছানাপত্র। কোন অস্বিধা হলে ঠিকঠাক করে দিতেন। বাসায় আগে আসলে নিজেই করতেন ভাইদের নাস্তা-বাবারের ব্যবহা। পরে এলে খাদেম আলী আহমদের নিকট খৈজখবর নিতেন। বাসায় ভাইদের অস্থি-বিস্থি মায়ের মতো আন্তরিক সেবা শুভ্রায় সৃষ্ট করে তুলতেন। শহরের পালা-পার্ব উৎসবে ভাইদেরকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতেন। একদিন বিকেল বেলা ভাইদের নিয়ে সদরঘাট থেকে একটি সাম্পান ভাড়া করে কর্মসূলী মদিতে মৌ-ক্রমল করেন। হাঁটাং ঝিশান কোণে মেঘ উঠে বৃষ্টি নামতে দেখে মাথা থেকে ক্যাপটি খুলে সৈয়দ সহিদুল হকের মাথায়, গাঁওর শাটটি সৈয়দ দিনাকর হককে, গেঞ্জিটি সৈয়দ এমদাদুল হককে এবং রমালখানা সৈয়দ মুনিরুল হকের মাথায় ঢাকতে দিয়ে নিজে উদোম পারে বৃষ্টিতে ভিজে লাগলেন।

ভাইদের প্রতি কঠাতুকু দায়িত্ববোধ-আন্তরিকতা থাকা প্রয়োজন- সেই শিক্ষা প্রজন্মকে দেখিয়ে দিয়েছেন বাস্তব জীবনের মধ্য দিয়ে।

সবার ছোট ভাই সৈয়দ সহিদুল হক। পেরেছেন সকলের অবারিত হৃদয়-হ্যাতা। শহর থেকে বাড়ি যেতে বড় দাদা রঞ্জিন ছবি ছাড়ার বই নিয়ে যেতেন। মজার মজার গল্প সুন্দর সুন্দর ছবি দেখিয়ে পাশে বসিয়ে পড়াতেন। প্রতিদিন সকালে পাচটা করে ইংরেজি শব্দ শিখাতেন। কোলে নিয়ে এখানে দেখানে বেড়াতেন। খাদেম ও মার আলী ফরিদের হেলে হোবহান সঙ্গে নিয়ে স্কুলে আনা-নেওয়া করতো। একদিন দেরী হওয়াতে সৈয়দ সহিদুল হক এক টুকরো ছোট ইট ছেলেটাকে ছুঁড়ে মারেন। এতে ছেলেটার মাথা ফেঁটে রক্ত পচ্ছে। তবে দোড়ে চাপবাবির পূর্বদিকে বাবার নিকট আশ্রয় পান। বাবার হাত ধরে শ্রমিকদের মাটি কাটার তদারকি দেখতে থাকেন। কিন্তু কৃষ্ণ পর বড়দাদা সেখানে উপস্থিত। জোর করে নিয়ে আসতে চাইলে বাবা বলেন, “থাক না।” তিনি জবাবে বলেন, “স্কুলে যেতে হবে তো।” সৈয়দ সহিদুল হক সাহেবের এই সৃষ্টি বর্ণনা করতে পিয়ে বলেন, “আমি তো ভাবলাহ- বোধহয় স্বরবীয় মার দেওয়া হবে।” ঘরে নিয়ে গেলে মা বলেন, “ছেলেটাকে স্কুল করেছে; ভাল করে শাস্তি দাও।” তিনি মাকে বুঝিয়ে বলেন, “ছেট তো! বুঁথে নি, মাঝ করে দেন। আর কথমো করবে না।” এই মধুর সৃষ্টি ভাইয়ের কথমো স্কুলেনি এবং স্কুলে যাওয়ারও নয়। এখানেও চিন্তাশীলদের জন্যে রয়ে গেল চিন্তার গঠনকৃত খোরাক।

#### আদর্শবান ছাত্র

মহাতাময়ী মায়ের শিশু সৈয়দ জিয়াউল হক চার বছর বয়সে পদার্পণ করে জীবন ও জগত সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হন।

তুলবার নতুন জামা কাপড় পরিধান করে ঝেহময়ী মায়ের ওঁচল ছেতে বগলে আমপারা নিয়ে পাঠ নিতে গেলেন বাবার কাছে হ্যবত গাউসুল আবাহ মাইজভাগারীর পবিত্র হজুরা শরিফে। ঝেহময়ী বাবার মুখে মুখে পাঠ করলেন, ‘রাবির জিন্দণী ইলমা।’

শিশু সৈয়দ জিয়াউল হক এখন ছাত্র। ছাত্র হিসেবে ছেটকাল থেকেই যেধাৰী হিলেন। অনুগ্রহ আদর্শের ছাত্র নামপুর আবু সোবহান উচ্চবিদ্যালয়ে আসা-যাওয়া করতেন নিম্নলুপ্তী হয়ে। শাস্ত-সুবোধ এই ছাত্রের চরিত্র ছিল অত্যন্ত অনু। মেজ ভাই সৈয়দ মুনিরুল হক তাঁর সাথেই আসা-যাওয়া করতেন। বাংলাদেশ সরকারের অবসরপ্রাপ্ত সচিব জনাব রেজাউল করিম সৃষ্টি রোমানুল করতে গিয়ে আবেগেজড়ি কঠে বলেন- “বিভীষ বিশ্বজুকুর শেষে পুনরায় চাঁচামান কলেজিয়েট স্কুলের ক্লাস চালু হওয়ার পর জনাব সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাগারী সাহেবকে আমার সহপাঠী হিসেবে পাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল। তিনি আমাদের সাথে নবম শ্রেণিতে যোগদান করেন। আমরা তাঁকে অত্যন্ত অনু, বিনয়ী ও সদাশালী সাধী হিসেবে পেয়েছিলাম। তিনি যে অনেক থণ্ডাগুণের অধিকারী ছিলেন তা তখন থেকে বুঝা যেত। ঐতিহ্যবাহী ওই স্কুলের সকল ক্লাসের ছাত্র ও শিক্ষকগুল তাঁকে অত্যন্ত স্বাদন ও সম্মের দৃষ্টিতে দেখতেন। ভবনকার সময়ের একমাত্র ছাত্র ছিলেন যিনি স্কুলে সৃজি ও পাঞ্জাবি পদে আসলে কোন শিক্ষকই কোন প্রকার কুইকা বলতেন না। আমাদের আরবি শিক্ষক তাঁকে ক্লাসে ‘হজুর’ বলে স্বোধন করতেন ও তাঁর সামনে আমাদেরকে আরবি পড়াতে সজ্ঞাবোধ করতেন। তাঁর মত একজন আধ্যাত্মিক কামেল বাস্তির সাথে একই স্কুলে পড়াশোনা করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করি।” বর্ণনার এমন হাজারো সৃষ্টি রোমানুল হবে এই যথা আদর্শিক পুরুষের। যা মুগ মুগ ধরে অঙ্গীহীন হয়ে চলতেই থাকবে। আজকের ছাত্র সমাজেরে তিনি আদর্শিক পথ; সফলতার পথ বাতলিয়ে দিয়েছেন। বাতলিয়ে দিয়েছেন কীভাবে নিজ চরিত্র, পরিবার, সমাজ জাতি গঠন করতে হবে। দিয়েছেন বক্তৃ-বাক্ষব, শিক্ষকের সাথে আচার-ব্যবহারের আদর্শিক ফর্মুলা।”

ইতিহাস শীর্ষস্থানের ভূলে না। তার উপর খোদার গুশে গুণাধিক হিসেবে গুলী হলে তো তুলবার প্রশংসন অবসর। চরিত্র-মীতি বিবর্জিত ছাত্র সমাজের মাঝে ‘উত্তম চরিত্রের প্রতিষ্ঠাপক শিক্ষক’ হিসেবে আল্টালেনে ক্লাসুল (দ.), বিশ্বালি শাহানশাহী হ্যবত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাগারী মাইলফুল হয়ে জাঙ্গল্যামান থাকবেন শেষ দিন পর্যন্ত। (চলবে)

# তাওহীদের সূর্য : মাইজভাণ্ডার শরিফ ও বেলায়তে মোত্লাকার উৎস সন্ধানে

## ● জাবেদ বিন আলম ●

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মোল্লা সাহেব একটু চিন্তা করে সাতটি হজ্জের সওয়াব ফেরিওয়ালা বেশধারী আগন্তুককে দান করে বিনিময়ে ঝুটি এবং পানি পান করে ক্ষুধা নিবৃত্ত করেন। ঝুটি-পানি পান করে মোল্লা সাহেব একটু শান্ত হয়ে আগন্তুকের গত্ব্য পথের দিকে কিছু দূর অগ্রসর হন। কিন্তু আগন্তুক কোথায় অদৃশ্য হয়ে দৃষ্টি সীমার বাইরে গেলেন তা তিনি অনুধাবন করতে পারেন নি। দেশে ফেরার আকুল বাসনায় মোল্লা সাহেব সমুদ্রের তীরে জাহাজের আশায় বসে থাকেন কিন্তু জাহাজের দেখা নেই। এ দিকে তিনদিন তিন রাত্রি অতিবাহিত হলে আবারো ক্ষুধার তীব্র জ্বালায় অস্ত্রির হয়ে উঠেন মোল্লা সাহেব। এ সময় আবারো খাদ্যের খাজাঞ্চি নিয়ে পুনরায় লোকটি হাজির হলে মোল্লা সাহেব সারা জীবনের প্রদত্ত যাকাতের বিনিময়ে ঝুটি-পানি গ্রহণ করেন। আবার তিনদিন তিন রাত্রি পর ক্ষুধায় মরণাপন্ন হয়ে পড়লে উক্ত ব্যক্তি খাদ্য পানীয়ের খাজাঞ্চি নিয়ে উপস্থিত হন। এবার সারা জীবনের সমস্ত নামাযের বিনিময়ে মোল্লা সাহেব খাদ্য-পানীয় গ্রহণ করেন। তিন দিন তিন রাত্রি অতিবাহিত হলে আবারো ক্ষুধায় অস্ত্রির মোল্লা সাহেব সমীপে উপস্থিত হন ফেরিওয়ালা বেশধারী উক্ত ব্যক্তি। এবার জীবনের সমস্ত রোয়ার বিনিময়ে মোল্লা সাহেব ঝুটি পানির মাধ্যমে ক্ষুধা নিবৃত্তি করেন। এদিকে আরো তিন দিন পর লোকটি ঝুটি-পানির খাজাঞ্চি নিয়ে হাজির হন। এবার মোল্লা সাহেবে বলেন, “এখন আমার কাছে আর কিছুই নেই। ঝুটি এবং পানির বিনিময়ে আমি সাত বার হজ্জের সওয়াব, সমস্ত যাকাত, সমস্ত নামায, সারা জীবনের রোয়ার সওয়াব আপনার নিকট বিক্রয় করেছি। ক্ষুধার জ্বালায় অনন্যোপায় হয়ে মোল্লা সাহেবে বলেন, এখন আর দেয়ার কিছু নেই। আমার ঝুটি-পানীয় অত্যাবশ্যক। এবার আগন্তুক লোকটি বললেন, ঝুটি ও পানির বিনিময়ে আপনার সাত বারের হজ্জ, জীবনের সমস্ত নামায, রোয়া, যাকাত বিক্রয় করেছেন তা এ সাদা কাগজে লিখে দিলে ঝুটি পানি দেব। অগত্যা মোল্লা সাহেব তাতে রাজী হন এবং পূর্ণ নাম ঠিকানাসহ আগন্তুক প্রদত্ত কলম দিয়ে সাদা কাগজে তা লিখে দেন। আগন্তুক ঝুটি-পানির খাজাঞ্চি মোল্লা সাহেবের সম্মুখে রাখেন। মোল্লা সাহেব আহার শেষ করে আগন্তুকের

আবাসস্থল সম্পর্কে জানতে চান। আগন্তুক কাগজ নিয়ে দ্রুত স্থান ত্যাগ করেন। মোল্লা সাহেব পিছু পিছু দৌড়ে গিয়েও লোকটির সন্ধান না পেয়ে সমুদ্র পাড়ে জাহাজের আশায় বসে থাকেন। এবার তিনি সমুদ্রে একটি জাহাজ দেখে মাথার পাগড়ি দুলিয়ে তাঁকে উঠানোর জন্য সংকেত দিলে জাহাজ থেকে তাঁকে নেয়ার জন্য নৌকা পাঠানো হয়। মোল্লা সাহেব উঠে দেখেন যে জাহাজে সকলে হিন্দুস্থানগামী হাজী। মোল্লা সাহেবের কেতাদন্ত্র পোশাক পরিচ্ছদ লক্ষ্য করে সকলে তাঁকে সম্মানের সঙ্গে সহযোগী করে নেন।

দেশে পৌঁছে মোল্লা সাহেব মহাখুশীতে পরিবার পরিজন ও পরিচিতদের সঙ্গে সাক্ষাত করে সাত বৎসর মক্কা শরিফে অবস্থান এবং সাতবার হজ্জের বিবরণ দেন। এর মধ্যে মোল্লা সাহেব একদিন বাবা ফরিদ সমীপে উপস্থিত হন। এ সময় বাবা সাহেবের দরবারে অনেক ওলী, দরবেশ, আলেম, ফাযেল, জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি করজোড়ে উপস্থিত ছিলেন। মোল্লা সাহেব দরবারে পৌঁছলে শায়খুল আলম বাবা ফরিদ তাঁকে দাঁড়িয়ে সাদর অভ্যর্থনা জানান। বাবা ফরিদ মোল্লা সাহেবের উদ্দেশ্যে বলেন, “বহু বৎসর পরে আপনার সাক্ষাত পেলাম। এতোদিন কোথায় ছিলেন? এখানে কেন আসেন নি? মোল্লা সাহেব এক প্রকার ব্যক্তিত্বসহকারে শায়খুল আলমের সঙ্গে মুসাফাহা করেন এবং কথাবার্তা ও আচার আচরণে এমন অহংকার ও উদ্বৃত্য প্রদর্শন করেন যে, যেন তিনি বাবা ফরিদের সমকক্ষ-এমন কি তাঁর চেয়েও বড় কিছু। মোল্লা সাহেব তাঁর দীর্ঘ সাত বৎসর মক্কা শরিফে অবস্থান, সাতবার হজ্জ পালন সহ নিজের ইবাদত-বন্দেগীর বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে নানা কাহিনী বর্ণনা করতে থাকেন। তিনি কাবা শরিফে নামায-রোয়ার যে প্রচুর সওয়াব পাওয়া যায় তাও তুলে ধরেন। দেশে ফেরার পথে জাহাজ ধ্বংসের ঘটনা এবং বিপদ সম্পর্কিত অবস্থা বর্ণনা করে পরবর্তীতে আল্লাহর মেহেরবাণীতে দেশে ফিরে আসার জন্যে শোকরিয়া আদায় করেন।

মোল্লা সাহেবের কাহিনী শুনে বাবা ফরিদ তাঁকে বড় ভাগ্যবান উল্লেখ করে সাতবার হজ্জ এবং সাতবার মদীনা শরিফ জিয়ারতের সৌভাগ্য অর্জন করায় ধন্যবাদ জানান। এ পর্যায়ে বাবা সাহেব মোল্লা সাহেবকে তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট কি না জিজ্ঞাসা

করলে মোঘ্লা সাহেবের অসম্ভষ্টি এবং রাগ-বিরাগের কোন বিষয় তাঁর মনে নেই বলে জানান। এ পর্যায়ে বাবা সাহেবের তাঁকে সাত বৎসর পূর্বে দরবার থেকে অসম্ভষ্ট হয়ে চলে যাবার কথা স্মরণ করে দিলেও মোঘ্লা সাহেবের নিকট ঘটনাটি জানা নেই বলে উল্লেখ করেন। মোঘ্লা সাহেবের বাবা ফরিদের নিকট ঘটনাটি জানতে চান।

তখন উক্ত মজলিশে সমবেত সকলের সম্মুখে বাবা ফরিদ ইসলাম ধর্মের ছয়টি রূক্ন প্রসঙ্গ উপস্থাপন করেন। এ কারণে মোঘ্লা সাহেবের ‘নসীহত করার পর জালিমদের নিকট বসো না’-পাক কোরআনের আয়াত উল্লেখ করে বাবা ফরিদের নিকট থেকে উভেজিত অবস্থায় বিদায় নেন। বাবা সাহেবের এ ঘটনায় খুবই মনোক্ষুণ্ণ হয়েছেন বলে উল্লেখ করেন। ঘটনা স্মরণ হলে মোঘ্লা সাহেব হেসে উঠে পুনরায় বলেন, “ফকির-দরবেশগণ এলমের অভাবে কিংবা স্বল্প এলম বশতঃ এমন সব উক্তি করেন যা শরিয়তের সম্পূর্ণ বিরোধী। ইসলামে পাঁচটি রূক্ন, ষষ্ঠি রূক্ন বলে কিছু নেই। জবাবে বাবা ফরিদ উল্লেখ করেন, “আমি বে-এল্ম বা আমার এল্ম অল্প।” কিন্তু এটি আমি লিখিত দেখেছি যে ইসলামের ষষ্ঠি রূক্ন ‘রূটি’। মোঘ্লা সাহেবের পুনরায় রেগে গিয়ে কোথায় লিখিত আছে তা দেখাতে বলেন। বাবা সাহেবে শান্তভাবে খাদেমকে একটি নির্দিষ্ট কিতাব আনার নির্দেশ দেন। কিতাব আনা হলে তিনি মোঘ্লা সাহেবে ব্যতীত সকলকে সরে পড়ার নির্দেশ দেন। এরপর কিতাবের পৃষ্ঠা খুলতে থাকেন। মোঘ্লা সাহেব কিতাবে কোন অক্ষর দেখতে না পেয়ে বলেন, “কিতাবে তো কোন অক্ষর নেই। এমতাবস্থায় হঠাতে নিজের হস্ত লিখিত কাগজ যাতে নামায, রোয়া, হজ্জ, যাকাতের বিনিময়ে তিন দিন পর পর রূটি-পানি খাওয়ার কথা লিখা রয়েছে তা দেখে চীৎকার করে উঠেন এবং বাবা ফরিদের পবিত্র কদমে লুটিয়ে পড়ে তাঁর নিকট বাইয়াত হন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কোন ব্যক্তির দুর্বল অবস্থান কখনো অন্যান্য ব্যক্তির সম্মুখে উপস্থাপন এবং প্রকাশ করা ত্বরিকতের নিয়ম নয়। যে কোন ব্যক্তির দুর্বলতা একান্তে জানানো ত্বরিকত অনুযায়ী শিষ্টাচারের লক্ষণ। বাবা সাহেব উপস্থিত সকল ভক্তদের বের করে দিয়ে একাকী মোঘ্লা সাহেবকে তার দুর্বলতা অবহিত করে ত্বরিকতের একটি মাসায়ালা স্পষ্ট করেছেন।

হ্যারত খাজা শেখ ফরিদ উদ্দিন গঞ্জেশকর (রহ.) এর ঘটনা থেকে যে বিষয়গুলো স্পষ্ট হয়েছে তা হলো মোঘ্লা সাহেবে ফেরিওয়ালা বেশধারী যে লোকটি থেকে সমস্ত প্রকার ইবাদত-আমলের বিনিময়ে রূটি কিনেছেন তিনি কে? তিনি কি কোন সাধারণ দোকানদার? তিনি যদি কোন দোকানদার হন

তাহলে মোঘ্লা সাহেবের স্বহস্তে লিখে দেয়া কাগজ কিভাবে বাবা সাহেবের নিকট আসলো? এ ঘটনায় মূলতঃ জাহেরী এল্ম থেকে বাতেনী এল্মের প্রাধান্য প্রমাণিত হয়েছে। বাবা ফরিদ উদ্দিন গঞ্জেশকর তাঁর সঙ্গে প্রতিহিংসাবশতঃ শক্রতায় লিঙ্গ যে কোন ব্যক্তিকে অনায়াসে ক্ষমা করে দিতেন। ক্ষমা করাই ছিল তাঁর চরিত্রের অন্যতম আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। বাবা ফরিদ ষষ্ঠি রূক্ন হিসেবে রূটির বিষয়টি পবিত্র কোরআন-হাদিসে উল্লেখ আছে বলে মোঘ্লা সাহেবকে বলেছেন। এ থেকে নিশ্চিতভাবে বলা যায় সূরা বাকারা, সূরা নহল, সূরা বনি ইসরাইল, সহ অনেক সূরার বিভিন্ন আয়াতে ধন-সম্পদ-রিজিক অন্বেষণ এবং তা ব্যয় সম্পর্কে স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে, যা মূল কথায় সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে, “খাও, পান করো কিন্তু অপব্যয় করো না।” হ্যারত বাবা ফরিদ সাহেবের এ ঘটনা স্পষ্ট করে দেয় যে, আমল-ইবাদত-পরহেজগারী নিয়ে অহংকার করতে নেই। কারণ ঈমান-আমল-ইবাদতের একমাত্র লক্ষ্য আল্লাহর প্রতি পরম আনুগত্য প্রদর্শন-যা শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নির্ধারিত। এ জন্যে শায়ের উল্লেখ করেন “হাজার বার কাবা শরিফের চৌকাঠে মাথা কুটলেও কোন ফলোদয় হবে না-যদি তুমি অন্তর থেকে পরম বিন্দুতায় আত্মসমর্পণ না করো।” উপর্যুক্ত ঘটনা বাবা ফরিদের বেলায়তের অবস্থান স্পষ্ট করে মহান আল্লাহর অসংখ্য রহস্য সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। বেলায়তে মোত্লাকার রূপ অনুধাবনের জন্যে বাবা ফরিদ এক অনন্য সুফি চরিত্র।

মাহবুবে এলাহী হ্যারত খাজা নিয়ামুদ্দীন আউলিয়া বাবা ফরিউদ্দীন গঞ্জে শকর এর খলিফাদের মধ্য থেকে চিশ্তিয়া ত্বরিকার তিনটি শাখার উত্তৰ ঘটে। একটি হ্যারত খাজা নিয়ামুদ্দীন আউলিয়ার (ক.) অনুসারীদের নিয়ে যা চিশ্তিয়া নিয়ামিয়া ত্বরিকা নামে পরিচিত। দ্বিতীয়টি হ্যারত শাহ মখ্দুম আলী আহমদ সাবের কালিয়ার (ক.) নামে-যা চিশ্তিয়া সাবেরীয়া ত্বরিকা হিসেবে পরিচিত। তৃতীয়টি হ্যারত জামাল উদ্দিন হাসুবি (রহ.) এর নামে চিশ্তিয়া হাসুবিয়া নামে পরিচিতি পায়। তবে চিশ্তিয়া ত্বরিকায় চিশ্তিয়া নিয়ামিয়া এবং চিশ্তিয়া সাবেরীয়া ত্বরিকার প্রভাব সর্বাধিক। সুলতানুল আউলিয়া মাহবুবে এলাহী হ্যারত খাজা নিয়ামুদ্দীন (ক.) বাবা ফরিদ উদ্দীন গঞ্জেশকর (ক.) এর নিকট বায়াত হবার পূর্বে হ্যারত বাবা সাহেবের অনুজ শেখ নাজীবুদ্দীন মুতাওয়াকিল (রহ.) এবং মুলতান হতে আগত আবু বকর কাউয়ালের নিকট তাঁর পীর সাহেবের বুয়ুর্গী, রিয়াজত,

মুশিদের প্রতি পরম শ্রদ্ধা এবং আনুগত্য সম্পর্কে আলোচনা শুনে বিচলিত হন। তখন থেকে তিনি ‘শেখ ফরিদ’ এবং ‘মাওলানা ফরিদ’ নাম উচ্চারণ করে তস্বীহ আদায় করতেন। এতে হ্যরত শেখ ফরিদ উদ্দীন গঞ্জেশকর (ক.) এর প্রতি তাঁর প্রাণাধিক মহবত, শ্রদ্ধা এবং তীব্র আকর্ষণের সৃষ্টি হয়। এ ধরনের মানসিক প্রেম তাড়নার মধ্যেই তিনি কোন প্রকার পাথেয় ছাড়াই বাবা ফরিদ (ক.) এর আস্তানা অজুধনে উপস্থিত হন। বাবা ফরিদ উদ্দীন গঞ্জেশকর তাঁকে দেখা মাত্রাই বয়েত আবৃত্তি করে উল্লেখ করেন, “আয় আ-তেশে ফেরাকাঁ দিল্হা কাবাব কার্দাহ। সায়লাবে এশ্তেয়াকাত জান্হা খারাব পর্দাহ।” অর্থাৎ ওহে তোমার বিছেদের আগুন দিলকে কাবাব করে দিয়েছে। তোমার মহবতের বন্যা প্রাণকে বিরাগ করে দিয়েছে।

বাবা ফরিদ (ক.) এর সঙ্গে সাক্ষাতের বিবরণ দিতে গিয়ে খাজা মাহবুবে এলাহী লিখেছেন, “৬৪৫ হিয়রীর ১০ রবাব বুধবার মুসলিম জগতের আশীর্বাদক সুলতানে তুরিকতের সঙ্গে একজন নগন্য গোলাম নিয়ামুদ্দীন বাদায়ুনী সাইয়েদ্যদুল আবেদীন হ্যরত শেখ ফরিদ উদ্দীন গঞ্জেশকর মাস্টুদ অজুধনী (ক.) এর কদম্বুসী করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিল। তিনি তখনই তাঁর মন্তক হতে চারতফি টুপী খুলে এই অধমের মন্তকে পরিয়ে দেন। তিনি তাঁর নিজের খাস খেরকা ও কাঠের খড়ম জোড়া দান করে বলেন, “হিন্দুস্থানের বেলায়েত এবং সাজাদৱৰ্ষণ নেয়ামত আমি অন্য একজনকে দান করতে চেয়েছিলাম, তখন তুমি অজুধনের পথে ছিলে। এমন সময় আমি মাথার উপর হতে আওয়াজ শুনতে পেলাম, “অপেক্ষা কর, নিয়ামুদ্দীন বাদায়ুনী আসছে, এই বেলায়েত তাকে দান করো।” জীবনে যাঁর সঙ্গে কখনো সরাসরি সাক্ষাত হয়নি, অদেখায় মহবতের সৃষ্টি এবং স্মরণ ও আনুগত্যের মাধ্যমে প্রথম দর্শনেই বেলায়েত প্রাপ্তি, এর রহস্য একমাত্র আলেমুল গায়েব ব্যতীত আর কারো জানা নেই। তাঁর এ ধরনের বেলায়েত প্রাপ্তি হ্যরত গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী (ক.) এর প্রথম দর্শনেই বেলায়েত প্রাপ্তির মতোই অভাবনীয় এবং বিশ্বয়কর। তবে হ্যরত গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী (ক.) কে মুরাদ হিসেবে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন হ্যরত সৈয়দ আবু শাহমা সালেহ লাহোরী (ক.) একই আসনে পাশে বসিয়েই বেলায়েত হস্তান্তর করেন।

প্রথম দিনের সাক্ষাতের এক পর্যায়ে সুলতানুল আউলিয়া, মাহবুবে এলাহী হ্যরত নিয়ামুদ্দীন (ক.) স্বীয় মহবত এবং সাক্ষাতের আবেগ সম্পর্কে বাবা সাহেবে সমীপে পেশ করতে

চাইলে বাবা সাহেবের প্রতাপ এতো বেশি প্রভাব বিস্তার করেছিল যে, তিনি কোন কথাই বলতে পারেন নি। অবস্থা দেখে বাবা সাহেব তখন বললেন, “তুমি যতটুকু মহবত এবং আবেগ বর্ণনা করতে চাচ্ছ, মূলত এর পরিমাণ তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি।

অজুধনে অবস্থানকালে খানকায় অবস্থানরত দরবেশগণ অত্যন্ত কষ্টকরভাবে জীবিকা নির্বাহ করতেন। জামাল উদ্দীন হাসুবী (রহ.), বদরুদ্দীন ইসহাক (রহ.) হেশাম উদ্দীন কাবুলী (রহ.) এবং খাজা নিয়ামুদ্দীন আউলিয়া প্রত্যেকের পৃথক পৃথক দায়িত্ব ছিল। হ্যরত খাজা নিয়ামুদ্দীন আউলিয়া তরকারী পাক করার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। একদিন তরকারী রান্নার সময় হ্যরত নিয়ামুদ্দীন আউলিয়া লক্ষ্য করলেন যে, ঘরে লবণ নেই এবং লবণ কেনার জন্য টাকাও নেই। তখন তিনি মুদির দোকান থেকে ধারে এক দিরহাম মূল্যের লবণ এনে তরকারী পাক করেন। খাবার সময়ে একত্রে বসে যখন আহার শুরু করেন তখন দেখা যায়, ‘খাবার উঠাবার জন্যে পেয়ালায় হাত রাখতে বাবা সাহেবের হাত ভার হয়ে যায়। বাবা ফরিদ (ক.) গ্রাস না উঠিয়ে বলে উঠেন, “এই খাদ্য হতে অপব্যয়ের গন্ধ আসছে।” তিনি জিজ্ঞেস করেন, “লবণ কোথা থেকে আনা হয়েছে?” এ ধরনের প্রশ্নে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় বহু কষ্টে মাহবুবে এলাহী বলেন, “ধারে এনেছি।” জবাব শুনে বাবা সাহেব বলেন, “নিজের নফ্সের খাহেশ পূর্ণ করার জন্যে কারো নিকট থেকে ধার নেয়ার চেয়ে দরবেশের পক্ষে মরে যাওয়া শ্রেয়। তাওয়াকুল এবং কর্জের মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য। স্মরণ রাখবে ঝণ্টান্ত দরবেশ যদি ঝণ্ট রেখে মারা যায় তবে কিয়ামতের দিন কর্জের বোঝার চাপে তার ঘাড় নত হয়ে থাকবে। এ কথা বলে তিনি সমস্ত তরকারী গরীবদের মধ্যে বিতরণ করে দেয়ার নির্দেশ দেন। এ দিন উক্ত বৈঠকেই সুলতানুল আউলিয়া কর্জের জন্যে একান্ত মনে তওবা করেন এবং জীবনে আর কোন দিন কর্জ করবেন না বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। কাশ্ফের দ্বারা বাবা সাহেবে খাজা সাহেবের তওবা বিষয়ে অবগত হয়ে নিজের আসনের কম্বলখানি নিয়ামুদ্দীন আউলিয়াকে প্রদান করে বলেন, “ইন্শাল্লাহ কোন সময় তোমার ধার করার প্রয়োজন হবে না।”

অজুধনে বৎসরাধিক সময় বাবা সাহেবের গভীর সান্নিধ্যে অবস্থান করে অবশেষে খাজা সাহেবের মুখে বাবা সাহেব নিজ মুখের লালা মোবারক দিয়ে বলেন, “বাবা নিয়াম! আল্লাহপাক তোমাকে দ্বীন এবং দুনিয়া উভয়টি দান করেছেন। এখানে সবকিছু আছে, অতএব তুমি হিন্দুস্থানের বেলায়েত গ্রহণ

করো। আগ্নাহ তোমাকে ইলম, আকল এবং ইশ্ক দান করেছেন। এ তিনটি নেয়ামত যার মধ্যে রয়েছে খেলাফতের যোগ্যতা সে ব্যক্তিই বটে। এরপর বলেন, যদি একান্তই কারো নিকট হতে ধার নিতে বাধ্য হও তবে তা অতিসত্ত্বের পরিশেষ করবে। নিজের প্রতিপক্ষকে সর্বাবস্থায় সন্তুষ্ট রাখতে যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। তাদেরকে কষ্ট দেবে না। তাদেরকে তোমার প্রতি অপ্রসন্ন হবার সুযোগ দেবে না।” উপস্থিত অনেক সুফি দরবেশের সম্মুখে খাজা নিয়ামুদ্দীন (ক.) কে বাবা সাহেব তাঁর মুর্শিদ কুতুবুল আকতাব হযরত কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী (ক.) প্রদত্ত পাগড়িটি পড়িয়ে দিয়ে সমগ্র হিন্দুস্থানের খিলাফত দান করেন।

হিন্দুস্থানের বেলায়তের দায়িত্ব নিয়ে বাবা সাহেবের নির্দেশ অনুযায়ী হাঁসীতে গমন করে তা তিনি হযরত জামাল উদ্দিন হাসুবীকে প্রদর্শন করে অনুমোদন নেন। দীন এবং দুনিয়ার পূর্ণ নেয়ামত পাওয়া সত্ত্বেও হযরত খাজা নিয়ামুদ্দীন আউলিয়া তখন দিল্লীর মসনদে অত্যন্ত প্রভাব, প্রতাপে সমাসীন মুসলিম বাদশাহ-সুলতান, আমীর-ওমরাহদের নিকট কখনো গমন করেন নি। প্রথম দিকে বেশ কয়েক বছর অত্যন্ত কষ্টকরভাবে জীবিকা নির্বাহ করেছেন। কখনো কখনো এক নাগাড়ে তিন-চারদিন উপবাসে কাটিয়েছেন। তবুও দৃঢ় মনোবল এবং অঙ্গীকার নিয়ে তিনি তাঁর বেলায়তের ঝাঙা উর্ধ্বে উত্তোলন রেখেছেন। রাজা-বাদশাহরা তাঁর সাক্ষাত প্রাণ্তির জন্যে বার বার আবেদন নিবেদন করলে তিনি জানাতেন, “আমার খানকাহতে দুটি দরজা রয়েছে। বাদশাহ যদি এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করেন তবে আমি অন্য দরজা দিয়ে বের হয়ে যাব।”

### কুতুবুদ্দীন মোবারক শাহ

যে সময় দিল্লীর সিংহাসনে আরোহন করেন সে সময় মাহবুবে এলাহীর বুয়ুর্গী এবং সুখ্যাতি সমগ্র হিন্দুস্থানে ছড়িয়ে পড়ে। হযরত মাহবুবে এলাহীর জনপ্রিয়তা এবং তাঁর খানকাহ অভিমুখে প্রতিনিয়ত ভক্ত-অনুরক্ত এবং সাধারণ মানুষের গমনাগমন কুতুবুদ্দীনের সহ্য হচ্ছে না। কুতুবুদ্দীন পরশ্রীকাতরতার বশীভূত হয়ে হযরত খাজা সাহেবের মুরীদ সুলতান আলাউদ্দীনের পুত্র খিয়ির খাঁকে হত্যা করে ফেলে এবং মাহবুবে এলাহী ও তাঁর ভক্ত-মুরীদদের কষ্ট দিতে শুরু করেন। একদিন দিল্লীর সুলতান কুতুবুদ্দীন তাঁর মন্ত্রী কাজী গয়নবীকে মাহবুবে এলাহীর খানকাহতে প্রত্যহ দুই সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা ব্যয়ের প্রসঙ্গটি জানতে চান। টাকার উৎস সম্পর্কে অবহিত হতে চাইলে মাহবুবে এলাহীর প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারী কায়ী গয়নবী জানান যে, রাজ্যের আমীর, ওমরাহ এবং রাজকর্মচারীরাই তাঁর

লঙ্গরখানার বিরাট খরচ যুগিয়ে থাকেন। বিষয়টি অবগত হয়ে দিল্লীর সুলতান রাজ্যের আমীর ওমরাহ ও রাজ কর্মচারীদের প্রতি নিয়ামুদ্দীন আউলিয়ার নিকট যাতায়াত করলে চাকুরী থেকে বহিকার এবং সম্পত্তি বাজেয়াফতের রাজাদেশ দেন। কোন শাহজাদা সেখানে গমন করলে তার ভাতা বন্ধ করার ঘোষণা জারি করেন। বাদশাহের ঘোষণার ফলে আমীর-ওমরাহদের যাতায়াত এবং হাদিয়া- তোহফা বন্ধ হয়ে যায়। সুলতানুল আউলিয়া সমগ্র বিষয় অবগত হয়ে লঙ্গরখানার তত্ত্বাবধায়ক খাজা ইকবালকে বলেন, “আজ হতে লঙ্গরখানার ব্যয় দ্বিগুণ করে দাও। অর্থের প্রয়োজন হলে ‘বিস্মিল্লাহ’ বলে ঐ তাকে হাত দিলে তোমার প্রয়োজন পরিমাণ টাকা পাবে। মাহবুবে এলাহীর আদেশ অনুযায়ী লঙ্গর খানার ব্যয় দ্বিগুণ করা হয়। এ সংবাদ পেয়ে সুলতান কুতুবুদ্দীন টাকার উৎস জানতে গুপ্তচর নিয়োগ করেন। সার্বিক তথ্য জেনে সুলতান হতবাক ও লজ্জিত হন।

এমতাবস্থায় বাদশাহ কুতুবুদ্দীন মোবারক শাহ মাহবুবে এলাহী সমীপে বার্তা পাঠান যে, “হযরত শেখ রূক্মুন্দীন (রহ.) বৎসরে, অন্তত: একবার মুলতান হতে এসে আমার সঙ্গে সাক্ষাত করতেন। আর আপনি দিল্লীতে থেকেও আমার দরবারে কখনো আসেন না। প্রত্যুভাবে মাহবুবে এলাহী জানান যে, “রাজা-বাদশাহের সঙ্গে সাক্ষাত করা আমার পীর ও মুর্শিদের রীতি নয়।” জবাব পেয়ে বাদশাহ ক্রেতে অগ্নিশৰ্মা হয়ে লোক মারফত সুলতানুল আউলিয়াকে বলে পাঠান, “আমার নির্দেশ আপনাকে অবশ্যই মান্য করতে হবে।”

বাদশাহের দণ্ডক্রিয়া অবহিত হয়ে মাহবুবে এলাহী তাঁর একজন খাদেমকে কুতুবুদ্দীন মোবারক শাহ এর পীর মাওলানা জিয়াউদ্দীন রূমী সমীপে প্রেরণ করেন। সুলতানুল আউলিয়া বাদশাহের পীরের নিকট এ বলে খবর পাঠান যে, “আপনি (পীর সাহেব) বাদশাহ কে নির্দেশ দিন, তিনি যেন ফকির দরবেশদেরকে উত্যক্ত না করেন।” খাদেম মাওলানা জিয়াউদ্দীন রূমী সমীপে পৌঁছে দেখেন যে, মাওলানা রূমী অস্তিম শয়নে শায়িত। সুতরাং সেদিক থেকে কোন লাভ হয়নি। এ দিকে মাওলানা রূমীর ফাতেয়ায় দেশের আলেম, ফাযেল, আউলিয়া দরবেশ প্রায় সকলেই উপস্থিত হয়েছেন। স্বয়ং বাদশাহও উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন। হযরত সুলতানুল মাশায়েখ মজলিসে পৌঁছামাত্র সকলে তাঁর সম্মানার্থে উঠে দাঁড়ান। কিন্তু বাদশাহ সে দিকে ঝক্ষেপ না করে পরিব্রত কোরআন তিলাওয়াতের ভান করে বসে থাকেন। উপস্থিত আলেম-মাশায়েখদের কেউ কেউ মাহবুবে এলাহীকে বলেন,

“বাদশাহ উপস্থিত রয়েছেন, আপনার তাকে সালাম করা উচিত। প্রত্যন্তে মাহবুবে এলাহী জানান, “বাদশাহ কোরআন শরিফ তিলাওয়াত করছেন, তাতে বাধা সৃষ্টি করা উচিত নয়।” হ্যরত মাহবুবে এলাহীর প্রতি সকলের সম্মান প্রদর্শনের দৃশ্য দেখে এবং তাকে সালাম না করায় বাদশাহ একদিন দেশের সমস্ত আলেম, ফাযেল, আউলিয়া দরবেশকে একত্রিত করে জানান, “আপনরারা নিয়ামুন্দীন আউলিয়াকে বলে দিন, তিনি যেন প্রত্যহ একবার আমার দরবারে হাজিরা দেন, না পারলে সওাহে একবার, তাও সম্ভব না হলে অন্ততঃ মাসে একবার। আর এর উত্তরে তিনি কি বলেন, তাও আমাকে অবশ্যই জানাবেন।” আলেম-দরবেশগণ সমবেতভাবে মাহবুবে এলাহী সমীপে উপস্থিত হয়ে বাদশাহ এর সিদ্ধান্ত সুলতানুল আউলিয়াকে অবহিত করে বলেন, “বাদশাহকে অসম্ভট করা সমীচীন নয়।” তাঁদের বক্তব্য শুনে সুলতানুল আউলিয়া বলেন, “ইন্শাল্লাহ” (যদি আল্লাহর ইচ্ছা হয়)। সুলতানুল আউলিয়ার বক্তব্য শুনে সকলে ধরে নেন যে, “তিনি বাদশাহুর সঙ্গে সাক্ষাতে রাজী হয়েছেন।” তাঁরা সুলতানুল মশায়েখের সিদ্ধান্ত বাদশাহকে অবহিত করেন। নির্দিষ্ট দিনে বাদশাহ হ্যরত খাজা নিয়ামুন্দীন আউলিয়ার প্রতীক্ষায় রাজদরবারে অপেক্ষা করতে থাকেন। তখন সফর মাস প্রায় শেষ, অর্থাৎ ২৭ তারিখ। সুলতানুল আউলিয়াকে এদিন দরবারে না দেখে বাদশাহ মনে করেন যে, “মাস তো প্রায় শেষ, আসছে মাসের প্রথম তারিখে তিনি অবশ্যই আসবেন।”

২৭ সফর সন্ধ্যার পূর্বক্ষণে শেখ ওয়াজীভুন্দীন কোরাইশী এবং হ্যরত আমীর খসরুর ভাতা আইজুন্দীন একই সঙ্গে সুলতানুল আউলিয়ার খেদমতে হাজির হয়ে বলেন, হজুর! আপনি নাকি বাদশাহ এর সঙ্গে সাক্ষাতে সম্মত হয়েছেন। প্রত্যন্তে সুলতানুল মশায়েখ জানান, “আপনারা এ বিষয় নিশ্চিত থাকুন যে, আমি কোন অবস্থায়ই আমার পীর-মুর্শিদগণের রীতি বিরুদ্ধ কাজ করব না।” মাহবুবে এলাহীর জবাব শুনে তাঁরা চিন্তাগ্রস্ত হলেন, এজন্যে যে, “ক্রোধে উন্নত হয়ে বাদশাহ কোন বিপদ ঘটিয়ে বসেন?” তাঁদের মনোভাব আঁচ করতে পেরে সুলতানুল আউলিয়া বলেন, “আপনারা নিশ্চিত থাকুন, আমার উপর বাদশাহুর কোন ক্ষমতাই চলবে না।” তাঁর এ উক্তি থেকে স্পষ্ট হয় যে, আল্লাহর প্রিয়তম বান্দা-আউলিয়াদের ক্ষমতা দুনিয়ার রাজা-বাদশাহ, সুলতান স্মার্টদের চেয়ে কতো অসীম-অনন্ত।

এ দিকে ১ রবিউল আউয়াল সমাগত। লঙ্ঘখানার পরিচালক খাজা ইকবাল হ্যরত নিয়ামুন্দীন আউলিয়া’র খেদমতে হাজির

হয়ে আরজ করেন, “হজুর! চন্দ্র উদয়-দিবসে তো বাদশাহুর সঙ্গে আপনার সাক্ষাত করার কথা। তবারকুক হিসেবে কি নিতে হবে আমাকে আদেশ করুন। পর পর তিনবার জিজ্ঞেস করেও কোন জবাব না পেয়ে খাজা ইকবাল নিশ্চিত হলেন যে, “পীর সাহেব কেবল বাদশাহুর দরবারে যাবেন না।”

এদিকে ২৯ সফর গভীর রাতে সুলতানুল আউলিয়ার প্রতি ক্ষুরু বাদশাহ আততায়ীর অতর্কিত হামলায় স্বীয় শয্যায় নিহত হন। এভাবে মহান আল্লাহ তাঁর মাহবুবে এলাহীকে স্বীয় ত্ত্বরিকার উর্ধ্বর্তন পীর-মুর্শিদের নীতিতে অটল থাকতে সাহায্য করেন।

### সুলতান গিয়াস উন্দীন তুগলক

হ্যরত খাজা নিয়ামুন্দীন আউলিয়ার ক্রমবর্ধমান প্রসার, বিশাল জনপরিচিতি এবং জনপ্রিয়তা দেখে মনে মনে তাঁর প্রতি সন্দিক্ষ হয়ে উঠেন। সুলতান গিয়াসউন্দীন বাংলাদেশ আক্রমণ করতে এসে হ্যরত মাহবুবে এলাহীকে একটি পত্র মারফত লিখেন যে, “গিয়াসপুরে আপনার আস্তানা থাকার দরজন সর্বদা এখানে মানুষের ভীড় লেগে থাকে। এতে রাজ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লোকদের স্থান সংকুলান হয় না। অতএব আমি দিল্লী ফেরার পূর্বেই আপনি মুরীদান সহ অন্য কোথাও চলে যাবার ব্যবস্থা করেন।” মাহবুবে এলাহী পত্র পাঠান্তে মন্তব্য করেন, “হানুয় দিল্লী দুরান্ত”। অর্থাৎ দিল্লী এখনো বহু দূরে। মূল কথা হলো সুলতানের অভিলাষ সফল হওয়া সুন্দর পরাহত। এদিকে সুলতান বাংলাদেশ হতে দিল্লী প্রত্যাবর্তনের পথে প্রথমে তুগলকাবাদ গমন করেন এবং সেখানেই সদল বলে গৃহ চাপা পরে মারা যান।

### সুলতান আলাউন্দীন খিলজী

তিনি হ্যরত মাহবুবে এলাহী খাজা নিয়ামুন্দীন আউলিয়াকে খুবই ভক্তি এবং শ্রদ্ধা করতেন। মাহবুবে এলাহীর প্রত্যক্ষ দর্শন লাভের জন্যে তাঁর আকুতির সীমা ছিল না। আলাউন্দীন খিলজী জানতেন, খাজা সাহেবের তাঁর চিরন্তন রীতি অনুযায়ী কোন বাদশাহুর সঙ্গে সাক্ষাতে করেন না। এর পরেও তিনি সুলতানুল আউলিয়ার প্রতি বিনীতভাবে সংবাদ প্রেরণ করেন যে, “হজুর একবার রাজধানীতে তশ্রিফ এনে আমাদেরকে ধন্য করুন।” এ ধরনের বিন্দু প্রস্তাবে মাহবুবে এলাহী বলে পাঠান যে, “আমি এক কোণে পড়ে রয়েছি। আপনার কোন প্রকার ক্ষতি করছি না। বাদশাহ এবং সমস্ত মুসলমানদের জন্যে দোয়া করছি। এর পরেও যদি বাদশাহ আমাকে সাক্ষাতে করার জন্যে পীড়াপীড়ি করেন, তাহলে আমি অন্য কোথাও চলে যাব।” সুলতান আলাউন্দীন খিলজী পুনরায় সংবাদ প্রেরণ করেন যে, “হজুর যদি রাজদরবারে আসতে না চান, তবে আমি নিজেই

ভজুরের খেদমতে হাজির হব।” প্রত্যুভাবে মাহবুবে এলাহী জানান যে, “আপনি কষ্ট করে এখানে আসবেন না। আমি এখান হতে আপনাকে দোয়া করছি। অদৃশ্য থেকে দোয়া করলে তা অধিক কার্যকর ও ফলপ্রদ হয়ে থাকে। এর পরেও যদি আপনি আসেন, আমার ঘরে দুটি দরজা রয়েছে। আপনি এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করলে, আমি অন্য দরজা দিয়ে বের হয়ে যাব।”

এতদসত্ত্বেও মাহবুবে এলাহী হ্যরত খাজা নিয়ামুদ্দীন আউলিয়ার প্রতি সুলতান আলাউদ্দীন খিলজীর ভক্তি ও শ্রদ্ধা হ্রাস পায়নি। মাহবুবে এলাহী সুলতানের মঙ্গল ও উন্নতির জন্যে দোয়া করতেন। মাহবুবে এলাহীর সঙ্গে সরাসরি সাক্ষাত হ্বার কোন সম্ভাবনা না থাকা সত্ত্বেও সুলতান আলাউদ্দীন খিলজী বিভিন্ন বাহানায় মাহবুবে এলাহীর সঙ্গে সাক্ষাতের চেষ্টার কোন প্রকার ত্রুটি করেন নি। মাহবুবে এলাহী সুলতানের আন্তরিকতা সম্পর্কে পূর্ণ মাত্রায় অবহিত ছিলেন, তবুও সাক্ষাতের অনুমতি দেন নি।

রাজা-বাদশাহ-সুলতান-স্মাইটদের সঙ্গে মাহবুবে এলাহীর সাক্ষাত না করার বিষয়টি শুধু তৃতীয়কার উর্ধ্বতন মশায়েখদের নীতি নয়, স্বয়ং বিশ্বনবী হ্যরত মুহাম্মদ (দ.) এর নির্দেশনাও বটে। হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, “রাসূলে খোদা (দ.) বলেছেন, “যে ব্যক্তি মরণচারী যায়াবর জীবন যাপন করে, সে রুক্ষ-স্বভাবের অধিকারী হয়ে যায়। যে শিকারের পেছনে ছোটে, সে উদাসীন হয়ে পড়ে। আর যে শাসকদের কাছে যাতায়াত করে, সে ফিত্নায় পতিত হয়”-(সুনানু আবি দাউদ ২৮৫৯)। হ্যরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, “রাসূলুল্লাহ (দ.) বলেছেন, নিচয়ই আল্লাহর নিকট সৃষ্টি জীবের মধ্যে অন্যতম ঘৃণ্য শ্রেণি হলো এমন কুরীরা (কোরআন পাঠক), যারা আমীরদের সাথে সাক্ষাত করে”-(তিরমিয়ি, ২৩৮৩)।

হ্যরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, “রাসূলে খোদা (দ.) বলেছেন, যখন তুমি কেনো আলিমকে দেখবে যে, সে শাসক গোষ্ঠীর সাথে অধিক পরিমাণে মেলামেশা করছে, তখন তুমি জেনে রেখো সে একটা চোর” -(আল ফিরদাউস : ১০৭৭)। শাসকদের দুয়ারে আলিম, দরবেশদের গমনাগমনে সীমাহীন ক্ষতি সম্পর্কে অসংখ্য হাদিস রয়েছে। মাহবুবে এলাহী বিশ্বনবী (দ.) এর নির্দেশনা সমূহ যথাযথভাবে অনুশীলন করে আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের সতর্ক করেছেন মাত্র।

মাহবুবে এলাহীর বিশুদ্ধতম প্রেমিক-আশেক হলেন ফার্সি কর্ম হ্যরত আমীর খসরু। সুলতানুল আউলিয়া তাঁকে এতো বেশি স্নেহ করতেন যে, এর কোন তুলনা নেই। আমীর খসরু রচিত শে'এর গুলো হ্যরত মাহবুবে এলাহী একাথচিত্তে শুনতেন এবং বার বার আবৃত্তি করতে নির্দেশ দিতেন। তাদের পারম্পরিক সম্পর্ক ছিল হাকীকী প্রেমিক-প্রেমাস্পদের মতো অতি গভীর। হ্যরত আমীর খসরু প্রেমিক প্রেমাস্পদের (আশেক-মাশুক) অবিনাশী সম্পর্কে বর্ণনা লিখেছেন, “মান্ তো শোদাম তো মান্ শোদী মান্ তো শোদাম তো জঁন শোদী। ত'কাস্ না গুইয়াদ আয় মান্ দীগারাম তো দীগারী”-অর্থাৎ আমি তুমি হলাম, তুমি আমি হলে, আমি দেহ হলাম, তুমি প্রাণ হলে, এরপর কেউ যেন বলতে না পারে, আমি একজন আর তুমি আরেকজন। হ্যরত আমীর খসরুর প্রতি মাহবুবে এলাহীর একান্ত মহবতের তাড়নায় বলেছিলেন, “শরিয়তে অনুমতি থাকলে আমি অসিয়ত করতাম যে, আমীর খসরুকে ওফাতের পর আমার কবরে আমার সঙ্গে দাফন করে দেবে। যেন আমরা দু'জন এক স্থানে থাকতে পারি।” এরপর তিনি অসিয়ত করেন যে, “আমার ওফাতের পর আমীর খসরু বেশিদিন বাঁচবে না। তার ওফাত হলে তাকে তোমরা আমার কবরের পার্শ্বে দাফন করবে। সে আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। আমি তাকে সঙ্গে না নিয়ে বেহেশ্তে পা রাখব না।” হ্যরত মাহবুবে এলাহীর ওফাতের সময় আমীর খসরু দিল্লীতে ছিলেন না। তিনি ছিলেন বাংলাদেশে। হঠাৎ একদিন তাঁর চিন্তে বিরান অবস্থা সৃষ্টি হলে সুলতান মুহাম্মদ তুগলকের অনুমতি নিয়ে তিনি দিল্লী চলে আসেন। আপন মুর্শিদের ওফাতের সংবাদ শ্রবণ করা মাত্র উম্মাদের মতো তিনি মাহবুবে এলাহীর মায়ারে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং চীৎকার করে বলেন, “সোবহানাল্লাহ! সূর্য জমিনের নীচে চলে গেছে, আর খসরু এখনো জীবিত।” এ কথা উচ্চারণ করে তিনি অজ্ঞান হয়ে যান। এরপর মাত্র ছয় মাস আমীর খসরু জীবিত ছিলেন। এ সময় তাঁর সমস্ত সম্পদ গরিব-মিসকিনদের মধ্যে দান করে আমৃত্যু মুর্শিদের মায়ারে অবস্থান করেন। ওফাত হলে আমির খসরুকে হ্যরত মাহবুবে এলাহীর মায়ারের পাশে নিচে দাফন করা হয়। মুর্শিদ এবং মুরীদের পারম্পরিক প্রেম তাড়নার এই এক বিরল নজীর স্থাপন করেন হ্যরত মাহবুবে এলাহী। (চলবে)

# পবিত্র কোরআন ও হাদিসের আলোকে উত্তরণের উপায় : প্রসঙ্গ মহামারী

## ● মাওলানা এস এম এম সেলিম উল্লাহ ●

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সুতরাং তাদের মত, পথ ত্যাগ করে আল্লাহওয়ালাদের পথ অন্বেষণ করায় প্রকৃত আল্লাহর অন্বেষণকারীর কর্তব্য। যারা রাসূল (দ.)-এর পরে আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে আদেশ নিষেধকারী। কোরআনে পাকের পরিভাষায় যাদেরকে ‘উলুল আমর’ বলা হয়। (নিসা:৫৯)

আর পরকালের রাজত্বের মালিক হবেন তারা  
এই পরকাল আমি তাদের জন্যে নির্ধারিত করি, যারা দুনিয়ার  
বুকে উদ্ধৃত্য প্রকাশ করতে ও অনর্থ সৃষ্টি করতে চায় না।  
খোদাতীরুদ্দের জন্যে শুভ পরিণাম। (কাসাস:৮৩)

ইহকালের রাজত্ব অন্বেষণকারীদের অবস্থাও আল্লাহতায়ালা  
স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন এভাবে- ‘অবশ্য আমি ইচ্ছা করলে  
তার মর্যাদা বাড়িয়ে দিতাম সে সকল নির্দশন সমূহের  
বদৌলতে। কিন্তু সে যে অধঃপতিত এবং নিজের রিপুর  
অনুগামী হয়ে রইল। সুতরাং তার অবস্থা হল কুকুরের মত;  
যদি তাকে তাড়া কর তবুও হাঁপাবে আর যদি ছেড়ে দাও তবুও  
হাঁপাবে।’ (আরাফ:১৭৬) ‘মানবকূলকে মোহগ্ন করেছে  
নারী, সন্তান-সন্ততি, রাশিকৃত স্বর্ণ-রৌপ্য, চিহ্নিত অশ্ব, গবাদি  
পশুরাজি এবং ক্ষেত-খামারের মত আকর্ষণীয় বস্তুসামগ্রী।  
এসবই হচ্ছে পার্থিব জীবনের ভোগ্য বস্তু। আল্লাহর নিকটই  
হলো উত্তম আশ্রয়।’ (ইমরান:১৪) ‘এরাই হলো সে লোক  
যাদের সমগ্র আমল দুনিয়া ও আধিরাত উভয়লোকেই বিনষ্ট  
হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে তাদের কোন সাহায্যকারীও নেই।’

(ইমরান:২২) ‘আর আল্লাহর হৃকুম ছাড়া কেউ মরতে পারে  
না-সেজন্য একটা সময় নির্ধারিত রয়েছে। বস্তুতঃ যে লোক  
দুনিয়াতে বিনিময় কামনা করবে, আমি তাকে তা দুনিয়াতেই  
দান করব। পক্ষান্তরে-যে লোক আধিরাতে বিনিময় কামনা  
করবে, তা থেকে আমি তাকে তাই দেবো। আর যারা কৃতজ্ঞ  
তাদেরকে আমি প্রতিদান দেবো।’ (ইমরান:১৪৫) ‘আর এমন  
কিছু লোক রয়েছে যাদের পার্থিব জীবনের কথাবার্তা তোমাকে  
চমৎকৃত করবে। আর তারা সাক্ষ্য স্থাপন করে আল্লাহকে  
নিজের মনের কথার ব্যাপারে। প্রকৃতপক্ষে তারা কঠিন  
বাগড়াটে লোক।’ (বাকারা:২০৪) ‘এরাই পরকালের বিনিময়ে  
পার্থিব জীবন ক্রয় করেছে। অতএব এদের শাস্তি লম্বু হবে না  
এবং এরা সাহায্যও পাবে না।’ (বাকারা: ৮৬) ‘অতঃপর  
তোমরাই পরম্পর খুনাখুনি করছ এবং তোমাদেরই একদলকে  
তাদের দেশ থেকে বহিক্ষার করছ। তাদের বিরুদ্ধে পাপ ও

অন্যায়ের মাধ্যমে আক্রমণ করছ। আর যদি তারাই কারও  
বন্দী হয়ে তোমাদের কাছে আসে, তবে বিনিময় নিয়ে তাদের  
মুক্ত করছ। অথচ তাদের বহিক্ষার করাও তোমাদের জন্য  
অবৈধ। তবে কি তোমরা গ্রন্থের কিয়দংশ বিশ্বাস কর এবং  
কিয়দংশ অবিশ্বাস কর? যারা এরূপ করে পার্থিব জীবনে দৃঢ়তি  
ছাড়া তাদের আর কোনই পথ নেই। কিয়ামতের দিন তাদের  
কঠোরতম শাস্তির দিকে পৌঁছে দেয়া হবে। আল্লাহ তোমাদের  
কাজ-কর্ম সম্পর্কে বে-খবর নন।’ (বাকারা:৮৫) ‘তোমরা  
পার্থিব সম্পদ কামনা কর, অথচ আল্লাহ চান আধিরাত। আর  
আল্লাহ হচ্ছেন পরাক্রমশালী হেকমতওয়ালা।’ (আনফাল:  
৬৭) ‘যে কেউ দুনিয়ার কল্যাণ কামনা করবে, তার জেনে রাখা  
প্রয়োজন যে, দুনিয়া ও আধিরাতের কল্যাণ আল্লাহরই নিকট  
রয়েছে। আর আল্লাহ সব কিছু শোনেন ও দেখেন।’ (নিসা:  
১৩৪) ‘তারা বলেঃ আমাদের এ পার্থিব জীবনই জীবন।  
আমাদেরকে পুনরায় জীবিত হতে হবে না।’ (আনআম: ২৯)  
‘তারা স্বীয় ধর্মকে তামাশা ও খেলা বানিয়ে নিয়েছিল এবং  
পার্থিব জীবন তাদেরকে ধোকায় ফেলে রেখেছিল। অতএব,  
আমি আজকে তাদেরকে ভুলে যাব; যেমন তারা এ দিনের  
সাক্ষাৎকে ভুলে গিয়েছিল এবং যেমন তারা নির্দশনকে অবিশ্বাস  
করত।’ (আরাফ: ৫১)

### বর্তমান পরিস্থিতি

পবিত্র কোরআনের এতগুলো আয়াত শুধু এটুকুই সাক্ষ্য দেয়  
যে, আল্লাহ মানবকূলকে শুধু আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জন করার  
জন্যই মাত্র এই পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। বর্তমান যুগে দেখা  
যায়, মানব গোষ্ঠীর এক বিরাট অংশ অলঙ্ক্ষ্যেই অনিষ্টকারী  
ফ্যাশনের অনুসারী হয়ে চলেছে। নানা ভূষণীয় অনিষ্টকারী  
ফ্যাশন সমূহকে সভ্যতা মনে করছে। কোরআনের পরিভাষায়  
যা নেশান্স-বিভোরচিত্ত বলা চলে। যেমন আল্লাহ বলেন, ‘হে  
লোক সকল! একটি উপমা বর্ণনা করা হলো, অতএব তোমরা  
তা মনোযোগ দিয়ে শোন; তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের বা  
যা কিছুর ইবাদত কর, তারা কখনও একটি মাছি সৃষ্টি করতে  
পারবে না, যদিও তারা সকলে একত্রিত হয়। আর মাছি যদি  
তাদের কাছ থেকে কোন কিছু ছিনিয়ে নেয়, তবে তারা তার  
কাছ থেকে তা উদ্ধার করতে পারবে না, কামনাকারী ও যার  
কাছে কামনা করা হয়, উভয়েই শক্তিহীন। অথচ যার পরিগতি  
বিপদজনক হওয়াই স্বাভাবিক।’ (হাজ্জ: ৭৩) পক্ষান্তরে  
সুফিবাদ মানবজাতিকে পরিনামদর্শী, অনিত্য, অনাসক্ত,

খোদা-আসন্ত, সাম্য, শান্তি, অল্লে সম্মত, বা “কানে” অর্থাৎ নিষ্পত্তিজনীয় পরিত্যক্ত নীর্বিলাস জীবন-যাপনে অভ্যন্তর করতে সমর্থ; যার ফলে বিশ্ববাসীর ধন-সঞ্চয় মোহ এবং ধন-কেন্দ্রিক ব্যবস্থা শিথিল হতে বাধ্য। আর তাতেই ধন-কেন্দ্রিক প্রতিযোগিতাত্ত্বাস পাবে। কারণ দৈনন্দিন জীবন যাত্রার খরচের উচ্চমান পাওয়ার লালসাই মানব গোষ্ঠিকে এই অতি রোজগার ও খাঁটুনির পথে ঢেলে দিচ্ছে। মানবজাতি বিচার, বুদ্ধি, ধর্ম, অ-ধর্ম, পরিনামের কথা ভূলতে চলেছে এবং স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিযোগিতাসমূহ প্রতিদ্বন্দ্বিতা, অতৃপ্ত কামনার পথে বিশ্ব, বিপর্যয়ের মুখে অগ্রসর হতে যাচ্ছে।

মানব জীবনে যা না হলেও চলে ঐ রকম অনর্থ বস্তুকে পরিত্যাগ করে চলার নাম সুফিবাদের ভাষায় “ফানা আনিল হাওয়া” (অর্থাৎ যা না হলেও চলে সেরূপ কাজকর্ম কথাবার্তা হতে বিরত থাকা যার ফলে জীবনযাত্রা সহজ ও ঝামেলা মুক্ত হয়) এবং “ফানা আনিল এরাদা” (নিজের ইচ্ছাকে আল্লাহর নিকট বিলীন করা)।

### আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (দ.) এর বাণী কি তা একটু বুঝতে চেষ্টা করি

মহান আল্লাহ রাবুল আলামিন বলেন, ‘পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে দাঁড়ানোকে ভয় করে এবং (সে) খেয়াল খুশি থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রেখেছে।’ (নাফিয়াত:৪০) ‘হে জিন ও মানব সম্প্রদায়, তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য থেকে পয়গম্বরগণ আগমন করে নি? যাঁরা তোমাদেরকে আমার বিধানাবলী বর্ণনা করতেন এবং তোমাদেরকে আজকের এ দিনের সাক্ষাতের ভীতি প্রদর্শন করতেন? তারা বলবে: আমরা স্বীয় গোনাহ স্বীকার করে নিলাম। পার্থিব জীবন তাদেরকে প্রতারিত করেছে। তারা নিজেদের বিরুদ্ধে স্বীকার করে নিয়েছে যে, তারা কাফের ছিল।’ (আনআম: ১৩০) ‘তাদেরকে পরিত্যাগ করুন, যারা নিজেদের ধর্মকে ত্রীড়া ও কৌতুকজপে গ্রহণ করেছে এবং পার্থিব জীবন যাদেরকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছে। কোরআন দ্বারা তাদেরকে উপদেশ দিন, যাতে কেউ স্বীয় কর্মে এমন ভাবে ঘোষিতার না হয়ে যায় যে, আল্লাহ ব্যতীত তার কোন সাহায্যকারী ও সুপারিশকারী নেই এবং যদি তারা জগতের বিনিময়ও প্রদান করে, তবু তাদের কাছ থেকে তা গ্রহণ করা হবে না। তারা নিজেদেরকে কৃতকার্যের জন্য ধ্বংস হবে। তাদের জন্যে উত্পন্ন পানি এবং যন্ত্রণাদায়ক শান্তি রয়েছে-কুফরের কারণে।’ (আনআম: ৭০)

### হাদিস শরিফ

রাসূলুল্লাহ (দ.) বলেছেন, আল্লাহর সম্মতি কামনায় যে ব্যক্তি ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু’ বলবে এবং এ বিশ্বাস সহকারে

ক্রিয়ামাতের দিন উপস্থিত হবে, আল্লাহু তার উপর জাহান্নাম হারাম করে দেবেন। (বোখারী:৫৯৮০ ই.ফা.) হ্যরত আবু হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (দ.) বলেছেনঃ আল্লাহু বলেন, আমি যখন আমার মু'মিন বান্দার কোন প্রিয়বস্তু দুনিয়া হতে উঠিয়ে নেই আর সে দৈর্ঘ্য ধারণ করে, আমার কাছে তার জন্য জান্নাত ছাড়া অন্য কিছু (প্রতিদান) নেই। (প্রাণ্ডু:৫৯৮১) হ্যরত আমুর ইবনু 'আওফ (রা.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর হাবিব (দ.) বললেনঃ তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো এবং তোমরা আশা পোষণ কর, যা তোমাদের খুশী করবে। তবে, আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের জন্য দারিদ্র্যের ভয় করছি না বরং ভয় করছি যে, তোমাদের উপর দুনিয়া প্রশংস্ত করে দেয়া হবে তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতের উপর যেমন দুনিয়া প্রশংস্ত করে দেয়া হয়েছিল। আর তোমরা তা পাওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা করবে যেমন তারা তা পাওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা করেছিল। আর তা তোমাদেরকে আখিরাত বিমুখ করে ফেলবে, যেমন তাদেরকে আখিরাত বিমুখ করেছিল। (প্রাণ্ডু:৫৯৮২)

হ্যরত পাক (দ) এর উপরোক্ত পবিত্র বাণীর প্রতিফলন বর্তমান সমাজে ব্যাপকভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি। দুনিয়ার ভোগবিলাস অব্যবহীন মুসলমানগণ প্রেমশূন্য ইবাদতে অভ্যন্তর হয়ে পড়েছে।

হ্যরত ইমরান ইবনু হুসায়ন (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী (দ.) বলেছেনঃ তোমাদের মধ্যে আমার যুগের লোকেরাই সর্বোত্তম। তারপর এর পরবর্তী যুগের লোকেরা। তারপর এর পরবর্তী যুগের লোকেরা। ইমরান (রা.) বর্ণনা করেন, নবী (দ.) এ কথাটি দু'বার কি তিনবার বললেন, তা আমার স্মরণ নেই-তারপর এমন লোকেরা আসবে যে, তারা সাক্ষ্য দিবে, অথচ তাদের সাক্ষ্য চাওয়া হবে না। তারা খিয়ানতকারী হবে। তাদের নিকট আমানত রাখা হবে না। তারা মানত করে তা পূরণ করবে না। তারা দেখতে মোটা তাজা হবে। (প্রাণ্ডু-৫৯৮৫)

হ্যরত মিরদাস আসলামী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (দ.) বলেছেন, নেকুকার ব্যক্তিরা একে একে চলে যাবেন। আর অবশিষ্টরা যব ও খেজুরের অব্যবহার্য অংশের মত পড়ে থাকবে। আল্লাহ এদের প্রতি গ্রাহ্যও করবেন না। (প্রাণ্ডু-৫৯৯১) হ্যরত ইবনু আবাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (দ.) বলেছেনঃ একুপ দুটি নিয়ামাত আছে যে ব্যাপারে বেশিরভাগ লোক ধোঁকায় নিপতিত : সুস্মাঞ্জলি ও অবসর সময়। (তিরমিজি-২৩০৪) হ্যরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (দ.) বলেছেনঃ

এমন কে আছে যে আমার নিকট হতে এ কথাগুলো গ্রহণ করবে এবং সে মুতাবিক নিজেও আমল করবে অথবা এমন কাউকে শিক্ষা দিবে যে অনুরূপ আমল করবে? আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (দ.)! আমি আছি। অতঃপর তিনি আমার হাত ধরলেন এবং গুনে গুনে এ পাঁচটি কথা বললেনঃ তুমি হারাম সমূহ হতে বিরত থাকলে লোকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় আবিদ বলে গণ্য হবে; তোমার ভাগ্যে আল্লাহ তা'আলা যা নির্ধারিত করে রেখেছেন তাতে খুশি থাকলে লোকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা স্বনির্ভর বলে গণ্য হবে; প্রতিবেশীর সাথে ভদ্র আচরণ করলে প্রকৃত মু'মিন হতে পারবে; যা নিজের জন্য পছন্দ কর তা-ই অন্যের জন্যও পছন্দ করতে পারলে প্রকৃত মুসলমান হতে পারবে এবং অধিক হাসা থেকে বিরত থাক। কেননা অতিরিক্ত হাস্য-কৌতুক হৃদয়কে মৃত্যু করে দেয়। (তিরমিজি: ২৩০৫)

আল্লাহ তায়ালা যে সব নবীদের বিশেষ নেয়ামত দান করেন, তাদের প্রশংসা করে কোরআনে বলেন, তারা যখন আল্লাহর আয়াতসমূহ শোনেন, তখন তারা সেজদাবন্ত হন এবং কান্নাকাটি করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, “যখন তাদের কাছে পরম করুণাময়ের আয়াতসমূহ পাঠ করা হত, তারা কাঁদতে কাঁদতে সিযদায় লুটিয়ে পড়ত”। (মারিয়াম:৫৮) আল্লাহ তায়ালা যাঁদের ইলম দান করেছেন তাদের প্রশংসা করেন, তাদের নিকট যখন আল্লাহর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হয়, তখন তারা কান্নাকাটি করে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, “আর তারা কাঁদতে কাঁদতে লুটিয়ে পড়ে এবং এটা তাদের বিনয় বৃদ্ধি করে।” (ইসরাঃ ১০৯)

আল্লাহর ফরযসমূহ আদায়ে যে কষ্ট স্বীকার করা হয় তা অবশ্যই আল্লাহর কাছে প্রিয়, আর এই কষ্ট স্বীকার করাই তুরিকতের পরিভাষায় ‘রিয়ায়ত’ বলে স্বীকৃত।

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হ্যরত ওমর (রা.) মদিনার গলিতে রাতে হেঁটে জনগণের খবর নিতেন এবং তাদের ব্যক্তিগত কাজও সময় সময় নিজ হাতে করে দিতেন। হ্যরত উমার (রা.) বলেন: ‘আমি প্রতিদিন সকালে এক বৃদ্ধার বাড়ীতে তার ঘরের কাজ করে দিতাম। প্রতিদিনের মত একদিন তার বাড়ীতে উপস্থিত হলে বৃদ্ধা বললেনঃ আজ কোন কাজ নেই। এক নেককার ব্যক্তি তোমার আগেই কাজগুলি শেষ করে গেছে। হ্যরত উমার (রা.) পরে জানতে পারেন, সেই নেককার লোকটি হ্যরত আবু বকর (রা.). খলিফা হওয়া সত্ত্বেও এভাবে এক অসহায় বৃদ্ধার কাজ করে দিয়ে যেতেন। হ্যরত ওমর (রা.) নিজের কাঁধে বোঝা বহন করে জনগণের দ্বারে পৌঁছে দিয়েছেন যা ইসলামের ইতিহাসে সোনালি

অঙ্করে লিখিত রয়েছে। সকল সাহাবায়ে কেরাম এই ভাবে পথে চলেছিলেন। মাওলানা জালাল উদ্দিন রূফি মসনবী শরিফে বলেনঃ শেষ জমানার বিপদ হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য সুফিয়ায়েকেরাম/যুগ প্রবর্তক আউলিয়া/আধ্যাত্মিক জ্ঞানী লোকদের অনুসরণ করা একান্ত দরকার। যারা আত্মার প্রেরণা-সম্মত চেতনা সম্পর্কে সজাগ, তারা সর্বক্ষণ কোরআনে পাকের নিম্নোক্ত আয়াতের বাস্তব প্রতিফলন নিজ জীবনে ঘটিয়েছেন। “মুমিনগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল না করে। যারা এ কারণে গাফেল হয়, তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।” (আল-মুনাফিকুন: ৯) অর্থাৎ যা সুখে-দুখে সর্বক্ষণ আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট থাকা বুবায়।

গাউসুল আয়ম দস্তগীর ব্যবসা সম্মাট উপাধিধারী হয়েও নিজ ব্যবসা পণ্যবাহী জাহাজ ডুবিতে এবং প্রচুর লাভ সহ বাণিজ্যতরী ফেরত আসার সংবাদে “আলহামদুলিল্লাহ” বললে খাদেমের প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, জাহাজ বা মালের জন্য নয় বরং সুখে বা দুঃখের সংবাদে আমার অন্তর স্মরণ বিচ্যুত হয়নি বলেই আলহামদুলিল্লাহ বলেছি। (বেলায়তে মোতলাকা, পৃ.৯৮) শাহ বু'আলি কলন্দর (র.) দিল্লির মুসলিম বাদশার উপহার ফেরত দিয়ে বলেছিলেন “নিয়ে যাও তোমার বাদশা একান্ত মোহতাজ ব্যক্তি। ফরিদের এত জিনিষের প্রয়োজন নাই। তোমার বাদশা এই বিশাল রাজ্য ও সম্পদের অধিকারী থাকা সত্ত্বেও পররাজ্য জয়ে রক্ষণাত্মক কামনা করে। তার ছোট দুটি চোখ অত্যন্ত। আমার অন্তর কামনায় মুক্ত ও খোদা সন্তুষ্ট। হ্যরত গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী (ক.) কুমিল্লার নবাব হোচ্ছাইনুল হায়দার প্রেরিত বহু উপহার ও টাকার স্তুপ লাঠির আঘাতে বিক্ষিণ্ডভাবে ফেলে দিয়েছিলেন। (বেলায়তে মোতলাকা, পৃ.৯৮)

বিশ্বালি শাহানশাহ হ্যরত মাওলানা শাহসুফি সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) কর্তৃক বহু মূল্যবান জিনিষপত্র ও টাকা পুড়িয়ে ফেলার ঘটনাতো কারো অজানা নয়। যেমন- পার্থিব কোন কিছুর প্রতি শাহানশাহ বাবাজানের লোভ কিংবা মোহ ছিল না। নিজের থাকার ঘরটির কাজও সম্পন্ন করতে না দিলে শেষ পর্যন্ত অসমান্তই থেকে যায়। মানুষের কাছ থেকে লোভনীয় বস্তু সামগ্রী অথবা টাকা নিয়ে জমা রাখতেন না। কারো কাছ থেকে নিয়ে অন্যদের দিয়ে দিতেন। নিজের প্রয়োজনীয় নয় এমন জিনিষ-পত্রও কিনতেন (অন্যকে দেওয়ার জন্য)। এক সাথে পঞ্চাশ হাজার, সত্তর হাজার, একলাখ এমনি করে বিপুল টাকা পুড়েছেন। তিনি বলতেন, ‘সব টাকা ভাল নয়, তাই পুড়তে হয়’। একবার চট্টগ্রামের কোন এক ধনী

লোককে টাকা যাবার সময় চল্লিশ হাজার টাকার একটা আলাদা বাস্তিলসহ এক লাখ পঁচিশ হাজার টাকা সঙ্গে নিতে বলেন। সে ব্যক্তির কার যোগে ফেনী পার হয়ে কুমিল্লা এলাকায় পৌছলে বাস্তিলটি নিয়ে রাস্তার উপর ছুঁড়ে দেন। গাড়ি থামিয়ে টাকাগুলো কুড়িয়ে নিতে চাইলে সে ব্যক্তিকে বলেন, “এ টাকা আপনার নয়; আল্লাহর টাকা, আপনার কি টাকা! বুঝতে চেষ্টা করুন, নতুবা আমি মারবো”।

কুলালপাড়ার রাজা মিএও বলেন, একবার পাঁচশ টাকার বিপুল নোট ছিঁড়তে দেখে কাছে গিয়ে সাহস করে বললাম, টাকাগুলো না ছিঁড়ে দাদা, আমরা গরীব দুঃখীদের দিলে ভাল হয় না? উভরে বলেন, ‘এগুলো হারাম টাকা তাই পুড়তে হয়, ছিঁড়তে হয়, ওসব তুমি বুঝবে না’। (শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.)-এর জীবনী শরিফ, পঞ্চদশ পরিমার্জিত সংস্করণ, পৃ.৯৩)

মাওলানা রফিম মসনবীতে বলেন : “ঐ ব্যক্তি প্রকৃত বাদশা, যিনি বাদশাহীর পরোয়া করেন না। চন্দ্র সূর্যের উপর তাঁর আলো প্রভাবশালী। সুফি পরিভাষায় যাকে পূর্বোল্লিখিত “ফানা আনিলা এরাদা” বলে। অর্থাৎ নিজের ইচ্ছার বিনাশ করে আল্লাহর ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেওয়া। আর আল্লাহর ইচ্ছা কি তা আশা করি আয়াতে কারিমা ও রাসূলে পাকের (দ.) হাদিস হতে আমরা বুঝতে পারলাম।

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুহাম্মদ (দ.)-এর পরিবারবর্গ মদিনায় আসার পর থেকে এক নাগাড়ে তিন দিন গমের রুটি পরিতৃপ্ত হয়ে থাননি এবং এ অবস্থায় তাঁর ওফাত হয়ে গেল। (বোখারী- ৬০১০) হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুহাম্মদ (দ.)-এর পরিবারবর্গ একদিনে দু'বেলা খানা থেয়ে একবেলা শুধু খুর্মা থেয়েই কাটিয়ে দিতেন। (প্রাণ্ড- ৬০১১) হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (দ.)-এর বিছানা ছিল চামড়ার তৈরী এবং তার ভেতরে ছিল খেজুরের ছাল। (প্রাণ্ড- ৬০১২) হযরত কুতাদাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা আনাস ইবনু মালিক (রা.)-এর কাছে এমন অবস্থায় গেলাম যে, তাঁর পাচক (মেহমানদারির জন্য) ছিল দাঁড়ানো। আনাস (রা.) বললেন, আপনারা খান। আমি জানি না, নবী (দ.) ইন্তিকালের সময় পর্যন্ত পাতলা রুটি দেখেছেন কিনা। আর তিনি কখনও ভুনা বকরির গোশতু দেখেননি। (প্রাণ্ড- ৬০১৩) হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের উপর দিয়ে মাস কেটে যেত, আমরা এর মধ্যে ঘরে (রান্নার) আগুন জ্বালাতাম না। আমরা কেবল খুরমা ও পানির উপর চলতাম। তবে যৎ সামান্য গোশ্ত আমাদের নিকট এসে

যেত। (প্রাণ্ড-৬০১৪) হযরত আবু হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (দ.) বলেছেন: সাত প্রকার লোককে আল্লাহর ছায়া দান করবেন। (তন্মধ্যে) এমন এক ব্যক্তি যে আল্লাহর যিকুর করে অতঃপর তার দু'টি চোখ অশ্রসিত হয়। (প্রাণ্ড-৬০৩৫)

হাদীস গুলোর ব্যাখ্যা ধনীদের জন্য সাবধানবাণী ও দরিদ্রদের (সুফি-দরবেশ) জন্য সুসংবাদবাণী। ধনী ব্যক্তিরা যেন মনে না করেন যে, আল্লাহর তাদের প্রতি খুব সন্তুষ্ট, এজন্য তাদেরকে ধনী বানিয়ে দিয়েছেন। কারণ একজন মুসলিমের জন্য দুনিয়া লাভ করা মূখ্য বিষয় নয় বরং মুখ্য বিষয় হচ্ছে আখিরাতে খোদার সান্নিধ্য/ জান্নাত লাভ করা। আর আল্লাহর রাসূল (দ.) ও তাঁর সাহাবীদের চেয়ে আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয় কে হবে? কিন্তু তাঁরা ছিলেন অত্যন্ত গরীব। এ রকম গরীব ঈমানদার লোক দিয়েই জান্নাতকে পূর্ণ করা হবে। (ফাতহুল বারী)

বর্তমান সংকটময় পরিস্থিতিতে বিশ্ব নবী (দ) র প্রকৃত আদর্শ-ই বিশ্বমানবতার জন্য স্রষ্টা অনুমোদিত শান্তিধারা। তাই প্রতিদ্বন্দ্বিতা, প্রতিযোগিতা, ধর্মকে চতুরজনের ব্যবসা রূপে ধর্ম বিমুখতা, নাস্তিকতা, ধনবৈষম্যতা [যেন তোমাদের বিভিন্নবানদের মধ্যেই ধনসম্পত্তি আবর্তিত না হয়। -সূরা হাশর:৭], ধর্মবৈষম্যতা [সমস্ত মানুষ ছিল একই উম্যত]। -সূরা বাকারাঃ-২১৩] পরিহার করে স্রষ্টার প্রেরিত শেষ মহাপুরুষ বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (দ) এর জীবনাদর্শে আদর্শী, প্রকৃত সুফিবাদের লালনকারী, বিশ্ব মানবতার জন্য কল্যাণধর্ম দিশারী, ধনতন্ত্র ও নাস্তিকতাবাদের মূলোৎপাটনকারী, ধনসাম্য উৎসাহী, বিশ্ব শান্তির প্রতীক, বেলায়তে মোতলাকা (অর্গলমুক্ত গ্রন্থী প্রেমবাদ)র দাবিদার, গাউসুল আয়ম হযরত মাওলানা শাহ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (ক.)’র প্রবর্তিত দর্শন চর্চার মধ্যেই নিহিত।

পরিশেষে তাঁর কদমে পাকে তাঁরই যোগ্য উত্তরসূরী, একমাত্র রেখে যাওয়া সাজাদানশীল এবং “অছি” হযরত শাহ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক) এর ভাষায় বলি-“ওহে বিশ্ব অলি! বিপদগ্রস্ত বিশ্ব, তোমার ফয়লতে রববানীকে কামনা করিতেছে। তুমি দর্শন ও ফয়জ রহমত দানে কৃতার্থ কর। গোলাকার পৃথিবীর বৃত্তে মানব সন্তান তোমার পিছনে ঘূরিয়া আসুক, একের পর এক শৃঙ্খলায় কাতারবন্দী ভাবে।” (বেলায়তে মোতলাকা, পৃ.১০২)

### “ফরিয়াদ”

তোমার দয়ার সীমা নাই রে (মাওলা) দয়ার সীমানাই  
তোমার দয়া বিনে সৃষ্টির বাঁচা হল দায়।

## জীবনালেখ

# হ্যরত হাফেজ সিরাজী (র.) এবং সত্য আবৃত বঙ্গনহীন কাব্যভাষা

## ● ড. সৈয়দ আবদুল উয়াজেদ ●

‘বেলায়তে মোত্লাকা’। বঙ্গনমুক্ত ঐশী প্রেমবাদ। যা প্রতিশ্রূত সময় ও সত্যের নির্দর্শন হিসেবে বিশ্ব-মানবতাকে বাঁচাতে বাংলার মাটিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যাকে বলা হয় বাংলার পবিত্র মাটিতে প্রবর্তিত একমাত্র তৃরিকা, তৃরিকা-ই মাইজভাণ্ডারীয়া, যাঁর প্রবর্তক খাতেমুল অলি গাউসুল আয়ম হ্যরত মাওলানা শাহসুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (ক.)।

এই তৃরিকার স্বরূপ উন্মোচন করে তা লিখিত ও মুদ্রিত অঙ্করে গ্রন্থে রূপদান করে উপস্থাপিত হয়েছে মানবতার এক ঐতিহাসিক ও অনিবার্য মুক্তির প্রয়োজনে। কী নেই এতে? বিশ্ব সৃষ্টিতে পূর্বের ঐশী রহস্যময় স্তুতায় মহান আল্লাহতায়ালার অভিপ্রায়, ‘গুণ্ঠন থেকে প্রেমময়তায় প্রকাশিত হওয়ার’। প্রথম সৃষ্টি নূরে মোহাম্মদী (দ.)। মহাবিশ্বের ঘন নিষ্ঠক নীলাভ হিম নিরবতার ভেতর হঠাতে আলোর ঝলক। এক পবিত্র ধ্বনির উত্তাস, যা অনুরণিত হলো মহাবিশ্বের সর্বত্র আনাচে-কানাচে। মহান আল্লাহর পবিত্র বাণী পবিত্র কোরআনুল করিমে মহান আল্লাহ নিজেই বলে দিলেন, শব্দটি ছিলো ‘কুন’ অর্থাৎ হয়ে যাও। আল্লাহ বলেন যে তিনি যখনই বলেন হও, আর তা তখনই হয়ে যায় (কুন, ফাইয়াকুন)। বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন বিগ ব্যাং তত্ত্বে। গ্রহ-উপগ্রহ, নক্ষত্রার্জি, অগণিত ছায়াপথ, মহাজগতিক মহাকাশে কী এক অপার রহস্যের মেলা। নিরবিন্দিত আবার সুনিয়ন্ত্রিত। মহাজগতিক, জ্যামিতিক, গাণিতিক, পদার্থ-রসায়ন, বর্ণালী, ছায়াতত্ত্ব, স্থাপত্যবিদ্যা, সংখ্যাতত্ত্বিক, যুক্তি ও হেঁয়ালির অন্তর্ভুক্ত ভাণ্ডার। তার মধ্যে ফুল-ফল, জীবিকা, সঙ্গীত, শব্দ, ধ্বনি, বৃক্ষ-অরণ্য, জড়-জীব জগৎসহ, কতো সৃষ্টি, মহাসৃষ্টির লীলাখেলা। এই অনন্ত-অধরা লীলাখেলায় ঐ সৌরভ ও নূরের ঝলকে দৃতিময় মহান স্তুষ্টা আল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্কের আরেক অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের ভাণ্ডার তাসাওফ। বেলায়ত, সুফিজ্ঞানে অনুরণিত মানুষের সাথে মহান মহাপবিত্র খোদাতায়ালার পরিচয়ের লীলাখেলা। বহুরূপে, অগু থেকে পরমাণুতে। অন্যদিকে অনন্ত অপরিমেয় বিশাল মহাশূন্যে।

বেলায়তের সমাপনী যুগে তাই রচিত হলো এক অসীম জ্ঞান ভাণ্ডারের দিশারী গ্রন্থ ‘বেলায়তে মোত্লাকা’। এটি রচনা করলেন হ্যরতে আকদাস, ‘খাতেমুল অলি হ্যরত গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী (ক.)-এর প্রপৌত্র ও অছিয়ে গাউসুল আয়ম, সুলতানুল আউলিয়া খাদেমুল ফোকারা হ্যরত মাওলানা শাহসুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.)। তিনি নিজে ছিলেন, বিনয় ও সৌজন্যের মূর্তপ্রতীক। তিনি এই গ্রন্থকে বললেন, এক ক্ষুদ্র প্রয়াস। কিন্তু তা পাঠ যিনি করেছেন, তিনিই অনুধাবন করতে পেরেছেন এ যে জ্ঞানের এক মহাসুদুর। তাই তো তাঁকে বলা হয় জ্ঞানসাগর রূহনী ভাষ্যকার। তিনি

তাসাওফের গোপন জগতের সকল রহস্যের উন্মোচনকারী। তিনিই খাদেমুল ফোকারা হ্যরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.)।

তাসাওফ সম্পর্কিত বিষয়াদি এই সময়ের মানুষের বোধগম্যের মধ্যে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে ‘বেলায়তে মোত্লাকা’ গ্রন্থটি একক মাহাত্ম্যের দাবিদার। তাসাওফ অনুসারী সুফি ও কবিগণ যারা সুফিবাদের গোড়ার দিক থেকে পরবর্তী সময়ে অমূল্য কাব্য রচনা করে গেছেন, তাদের অগ্রগণ্যদেরও এই গ্রন্থে প্রাসঙ্গিকভাবেই উদ্বৃত্ত করা হয়েছে। এই গ্রন্থে ইরানের বুলবুল পৃথিবীর অন্যতম কবি হাফিজকে সম্মোধন করা হয়েছে ‘হ্যরত হাফেজ সিরাজী (র.)’ হিসাবে। কবি হাফেজের ‘দিওয়ান’ থেকে তাই যে গভীর তাৎপর্যময় কাব্যটি এই গ্রন্থে উদ্বৃত্ত করা হয়েছে, সেটি হচ্ছে: ‘ওহে হজ্জের ফেরেশতা তুমি আমার উপর প্রভাব বিস্তার করো না; যেহেতু তুমি ঘরই দেখ, আর আমি নিজেকে খোদার ঘর (হিসেবে) দেখি।’ (‘বেলায়তে মোত্লাকা’ বাংলা সংস্করণ, ২০১৭, পৃ. ১১৯)।

তাসাওফ অনুসারী কবিতার বাণী যে ইলহাম পর্ষায়ের হতে পারে তাও আধুনিক কালের পাঠকদের কাছে পরিষ্কার করে দিচ্ছে ‘বেলায়তে মোত্লাকা’। সে কারণেই এ গ্রন্থে মাওলানা রূমি (র.)-এর মসনবী শরিফ থেকে উদ্বৃত্ত হয়েছে ‘যাহারা খোদার ‘এলহাম’ বা বাণীর মালিক তাহারা জীবন সার্থককারী এবং যাহারা অনুমান ও কল্পনাবিলাসী তাহারা জীবন বিনাশকারী বিষতুল্য।’ (বেলায়তে মোত্লাকা, বাংলা সংস্করণ, ২০১৭, পৃ. ১২০)। কাজেই সুফিকাব্যের মধ্যে নানা ভাবব্যঞ্জনা, উপমা-উৎপ্রেক্ষা ও হেঁয়ালি বাণীর ভেতর যে মহান স্তুষ্টার সাথে খোদাপ্রেমি মানবসন্তার সত্যদর্শনের নিগৃঢ় কথপোকথন রয়েছে সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। সংগত কারণেই গ্রন্থকার ‘ওহি’ ও ‘ইলহাম’-এর মধ্যকার পার্থক্যকে যথাস্থানে ব্যাখ্যা করেছেন সুন্দরভাবে।

কবি হ্যরত হাফেজ সিরাজী (র.) এর জন্ম ও বাল্যজীবন সম্পর্কে বিস্তারিত তেমন কিছু জানা যায় না। তবু যতেকটুকু জানা যায়, চতুর্দশ শতাব্দীর শুরুর দিকে পারস্যের রাজধানী সিরাজনগরে তাঁর জন্ম। শিশু হাফেজের দীপ্তিময় মুখাবয়ের দেখে পিতা-মাতা তার নাম রেখেছিলেন শামস উদ্দিন। তার পিতা বিত্বান ছিলেন না বটে, তবে অসচ্ছলও ছিলেন না। তাকে তারা ভালভাবেই লেখাপড়া করিয়েছিলেন।

কবি হাফেজ শিশুকাল থেকেই ছিলেন মেধাবী, গ্রন্থ পাঠে একাগ্র, চিন্তাশীল এবং নানামুখী বিদ্যায় পারদর্শী। সাহিত্য, দর্শন ও মরমী সাহিত্যে তাঁর অধ্যয়ন-পাণ্ডিত্য সুগভীর ছিলো। যৌবনে তিনি একজন প্রখ্যাত ধর্মীয় সাধকের কাছে মুরিদ হওয়ার দীক্ষা গ্রহণ করেন। এইভাবে অল্প বয়সেই তাসাওফের জগৎ ও ‘সুফি’

সমাজে তাঁর পদার্পণ ঘটে। তাঁর কবিতা প্রতিভার কথা তৎকালিন পারস্য সাম্রাজ্যে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। রাজ দরবার, ধনী-অভিজাত গুণ্ঠাহীরা তাঁকে আমন্ত্রণ জানাতেন। কিন্তু ঐশ্বর্য আড়ম্বরের মধ্যে তিনি কোনো ধরনের সৌন্দর্য খুঁজে পেতেন না। জন্মস্থানের প্রতি তাঁর ছিলো অপরিসীম ভালবাসা।

মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ তাঁর পারস্য প্রতিভা গ্রহে কবি হ্যরত হাফেজ সিরাজি (র.) এর আধ্যাত্মিক তৎপর্য সম্পর্কে লিখেছেন, যারা তাসাওউফের তত্ত্বানুসন্ধানী, তাদের কাছে ‘দিওয়ান’ ভাবরাজ্যের অমূল্য সম্পদ। দিওয়ানের একমাত্র সুর প্রেমোন্নততা। প্রেমের আবেশেরই অপর নাম দিয়েছিলেন তিনি শরাব। আর প্রেম যিনি কবির হৃদয়ে সিদ্ধিত করেন সে মুর্শিদ হলেন তাঁর সাকি। সাকি বলকে বলকে ভাবপিয়াসীদের তৎপারত হৃদয়ে প্রেমাবেশের তীব্র সুরা দিতে থাকেন। আর তারা তা আকর্ষ পান করে এবং মন্ত হয়ে মহান স্তুষ্টার সান্নিধ্যের অপূর্ব আনন্দ ও মন্ততা উপভোগ করতে থাকেন। তাই কবি মুর্শিদকে কখনো সাকি, কখনো বুলবুল এরকম প্রিয় সম্ভাষণে অভিহিত করেন। প্রেমের পথিক কবির মুর্শিদ ছাড়া কোনো কথা নাই; কারণ মুর্শিদ ছাড়া তাঁকে অমৃতের সন্ধান আর কেউ দিতে পারেন না। আর তাই কবি নির্ভয়ে লিখেছেন :

বা মায় ছাজাদা রঙীন কোন্  
গারাণ্ড পীরে মোগাঁ গোইয়াদ  
কে ছালেক বেকবর না বুয়াদ  
যে রাহ ও রেছমে মন্জেল্হা।

এ কবিতার অর্থ হলো, পীর যদি বলেন, জায়নামায মদিরাসিঙ্ক করতে, কৃষ্ণিত হয়ে না। কারণ পথ ও পথের রেওয়াজ সমন্বে তিনিই ভালভাবে অবগত আছেন (অনবধান নন)। প্রেমোন্নত কবি মাঝে মাঝে কল্পনার উচ্চতরলোকে উঠতে উঠতে মুর্শিদেরও মুর্শিদ সেই আল্লাহকে সামনে অনুভব করেন; যেন এক ইঙ্গিত প্রয়োগিনী। সাধক কবি যখন ভাবাবেশে তন্মুহ থাকেন তখন তিনি রাজাধিরাজ। পার্থিব কোনো চিন্তা বা কামনা সে সময় তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ তখন তাঁর কাছে তুচ্ছ।

হাফিজ বলেছেন:

কনুন কে মী দমদ আষ বুস্তনে নছীমে বেহেশ্ত  
মান্ড ও শারাবে ফেরাহ-বখশ ও ইয়ারে হৱ-চেবেলত;  
গাদা চেরা না যানাদ লাফে ছোলতানাণ এম্রোজ  
কে খীমা ছায়ায়ে আরব আন্ত ও বজ্মগাহ লাবে কেশত।  
চুন্দ বেখোদ গাশ্ত হফেজ কায় শোমারাদ  
ব'ইয়াক জও মেলকাতে কাউচ ও কায়রা।

যার অর্থ: আহ কী সুন্দর বেহেশ্তি দক্ষিণা হাওয়া প্রবাহিত হচ্ছে। সেই সাথে হৃদয় প্রফুল্লকারী মদিরা আর হৱ-চেহারা সখা (মুর্শিদ)। কী মধুর মিলন। ভিখারী (হাফিজ), কেন এখনও শাহি দর্পে হংকার দিচ্ছ না? আজ যে মেঘমালা তোমার তাঁবুর ছাদ আর মুক্ত প্রান্তর আর মুক্ত প্রান্তর তোমার দরবার-ভূমি! হাফেজ যখন আবেশে আত্মহারা হয়, তখন সে কায় ও কাউচের বিশাল সাম্রাজ্যকে এক যব সমানও মূল্যবান মনে করে কী?

আবার ভাবাবেশে যখন ভাট্টা আসে কবি তখন একান্ত অধীর হয়ে পড়েন। সুখানুভূতির ক্ষণিক অভাবও তার অসহ্য মনে হয়। তিনি

তখন তাঁর জোয়ারের উৎস মুর্শিদের পুনঃশুরণাপন্ন হন। হাফেজ তাই বলেছেন:

আলা'ইয়া আইওহা সাকি, আদের কাছা ও নাবেল হা,  
কে এশ্ক আছা নমুদ আউয়াল, ওয়ালে ওফতাদ মোশ্কেল হা।  
যার অর্থ: হে সাকি, পেয়ালা দ্রুত চালনা কর। প্রেম প্রথম বড়  
সহজ মনে হয়েছিল, কিন্তু এখন বড়ই মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছে।  
(পারস্য প্রতিভা, মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র  
প্রকাশনা ১১৮, তৃতীয় সংস্করণ, ঢাকা, পৃ. ৯৮, ৯৯)

ইতিহাসের নানা উপাদানের আলোকে দেখা যায়, হাফেজ নিজেকে ‘রিন্দা’ বলে ঘোষণা করতেও কৃষ্টাবোধ করেন নি। ‘রিন্দা’ শব্দটির পারস্য প্রেক্ষাপটে অর্থ হচ্ছে একটি সম্প্রদায়ের মুসলমান ফকির। তাঁদের মতে সাধারণ শাস্ত্রাদেশ এবং নামায রোয়া ইত্যাদি লোকাচার মাত্র। এসবে সময় ক্ষেপণ না করে তারা ধ্যান সাধনা অভ্যাসের আনন্দ উপভোগ করা শ্রেয়ো মনে করেন। তবে তাঁর জীবন উচ্ছৃঙ্খল ছিলো একথা কেউ বলেন নি। (সূত্র :  
প্রাণকু, পৃ. ১০০, ১০১)

কবি হ্যরত হাফেজ (র.) এর ব্যক্তিগত পারিবারিক জীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। কথিত আছে তিনি উজির কেয়ামুদ্দিনের প্রতিষ্ঠিত এক কলেজে কোরআনের ব্যাখ্যাকারী অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এ কলেজ তাঁরই জন্য স্থাপিত হয়। তিনি কিছুদিন সেখানে অধ্যাপনা করেছিলেন। তার মৃত্যুদিবস নিয়েও ইতিহাসবিদ্দের মধ্যে নানা রকম মতাপার্থক্য রয়েছে। প্রসিদ্ধ ইতিহাসিক দৌলতশাহ'র মতে ৭৯৪ ‘হিজৰী সনে, খ্রিস্টিয় ১৩৯১ সালে তিনি ইন্তিকাল করেন। কারো কারো মতে এই মহাপুরুষ মহাসাধক খিজির। কিন্তু এই গল্পের আরেকটি বিবরণ হচ্ছে ছাত্র-জীবনে হাফেজ লিখিত কবিতা মানুষের কাছে সমাদর পায়নি। পরে তিনি ‘বাবা কুহী’ নামক সিরাজের উত্তরে অবস্থিত এক পার্বত্য দরগায় দরবেশ ইমাম আলীর সাথে সাক্ষাৎ করে দোয়া গ্রহণ করেন। এরপর থেকে অপূর্ব কাব্য প্রতিভায় তিনি বিশ্বসমাদৃত হন।

হাফেজ সিরাজী (র.)-এর কাব্য সম্পর্কে একটি বিশ্বয়কর কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। যদি কেউ আগ্রহী হয়ে পবিত্র হয়ে সংযত মনে হাফেজের কাব্যগ্রন্থ খুলে, তাহলে প্রথম যে পৃষ্ঠা বের হবে তাতে তার জিজ্ঞাসার যথাযথ উত্তর পাবে। প্রথ্যাত কবি জামি তাঁর ‘সুফিবন্দের ইতিবৃত্ত’ গ্রন্থে হাফেজকে ‘লেছানল গায়ের’ বা ভবিষ্যত্বজ্ঞ হিসেবে অভিহিত করেছেন এভাবে:

মর-দানে খাক হাম খব্রে আসমান দেহান্দ  
ফাল কালামে হাফেজ তেরাজ কোন্দ লেহাজ।

এর অর্থঃ পৃথিবীর লোকেও আকাশের সংবাদ দিয়ে থাকে, অতএব হাফেজের ভবিষ্যৎ বাণীতে বিশ্বাস স্থাপন করো।  
(প্রাণকু, পৃ. ১০১, ১০২)

কবি হাফেজ সিরাজী (র.) এর ভক্ত ও বন্ধু ছিলেন গুল আনন্দাম। হাফেজের ইন্তিকালের পর তিনি হাফেজের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এবং কঢ়ে কঢ়ে গাওয়া গজল ও নাগমা সংগ্রহ করা শুরু করেন। সংগৃহীত হাফেজের এই সব কাব্য, গজল ও নাগমা'র সংকলিত গ্রন্থের নাম হলো ‘দিওয়ান-ই-হাফিজ’। জীবদ্ধশায় যা হাফেজ দেখে যেতে পারেন নি। পরে ভারতের বিখ্যাত তাত্ত্বিক, বুজুর্গ,

মাওলানা শিবলি নোমানী হাফেজের নামে প্রচলিত দেড় হাজার দিওয়ান বাছাই করে ৭৯টি প্রতিনিধিত্বশীল দিওয়ান সংকলন বা একত্রিত করে সেগুলোকে তিনি উর্দ্ধতে অনুবাদ করেন। শিবলি নোমানী এই সংকলনের নাম দেন ‘শিরুল-আয়ম’। এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগে। (সূত্র: শামসুল আলম সাঈদ রচিত ‘হাফিজ ও বিস্ময়কর দিওয়ান’, এডৰ্ন পাবলিকেশন, ঢাকা, বাংলাদেশ, ১ম সংস্করণ ২০১২, পৃ. ৫৭) হাফেজের বন্ধু মুহাম্মদ গুল আনন্দাম বলেছেন, হাফেজ বা হাফিজ নামটি কবি হাফেজের পিতৃপ্রদত্ত নাম নয়। কবি হাফেজ সিরাজী (র.) শৈশবে পরিত্র কোরআন হেফজ বা মুখ্যস্ত করেছিলেন বলে তার আসল নাম মুহাম্মদ শামস উদ্দিন ছাপিয়ে কবি হাফেজ হয়ে উঠেছে। ইতিহাসবিদ দৌলতশাহ তৎকালীন কবিদের নিয়ে যে দু'টি স্মৃতিমূলক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন সেগুলো হলো ‘জামির বাহারিস্তান’ এবং ‘নাফাহাতুল উনস’। লুৎফে আলি বেগের ‘আতশখাদা’ গ্রন্থেও কবি হাফেজ (র.) সম্পর্কে কিছু কিছু উল্লেখ দেখা যায়। তিনি ছিলেন জাতিতে পারস্যের ‘তুয়াসির কান’। তিনি ছিলেন কোরআনে হাফেজ। অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে সুমিষ্ট উচ্চারণে ঘোল রকমভাবে (সুরে) কবি হাফেজ কোরআন তেলাওয়াত (পাঠ) করতে পারতেন। এই গুণের জন্য বাদশাহীর দরবারে তার ডাক পড়েছিলো। ধর্মীয় মাহফিলে কোরআন তেলাওয়াত ছাড়াও তিনি পরিত্র আয়াতসমূহের যে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতেন সেগুলো খুবই গ্রহণযোগ্য ছিলো। আরবি ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর ছিলো গভীর জ্ঞান। ঐ ভাষাতে তত্ত্বাদির বর্ণনা সবাইকে মুক্ত করে ফেলেছিল। তৎকালীন বিখ্যাত ব্যক্তি ও জ্ঞানী-গুণীরা কবি হাফেজের যে কোনো উক্তিকে খুব সম্মানের সাথে তাঁদের চিন্তা এবং বক্তব্যে ব্যবহার করতেন। এতে ধারণা করা যায় রক্ষণশীল গোষ্ঠীর প্রবল বৈরিতা সত্ত্বেও জ্ঞানী-গুণী সমাজের অংসর অংশ এবং রসগোষ্ঠী শ্রেণির লোকের কাছে কবি হাফেজ সমসাময়িককালে অত্যন্ত সমাদৃত হয়ে উঠেছিলেন। (প্রাণ্ত, পৃষ্ঠা ৫৮, ৫৯)

মহান স্মৃষ্টির সম্মতি অর্জন করার মধ্য দিয়ে বিশুদ্ধ বিশ্মানবতার এক অবিস্মরণীয় উচ্চারণ ‘বেলায়তে মোত্লাকা’। এক স্মৃষ্টির প্রতি অবিচল বিশ্বাস আর শুন্দি মানবিক চরিত্র অর্জনের সর্বাঙ্গীণ আধুনিক পদ্ধতি সমূহ উন্মোচিত হয়েছে এই গ্রন্থে। অতীতের সুফি, সাধক ও সুফিবাদী কবিদের সাধনা সংগ্রামের কথাও এখানে আলোচিত হয়েছে। বাংলার জমিনে তুরিকায়ে মাইজভাগারীয়া বিশ্বের তাসাওউফপন্থীদের জন্য ধর্মসাম্য ও অসাম্প্রদায়িকতার মধ্য দিয়ে মহাসত্যকে পাওয়ার সর্বশেষ দিগনির্দেশনা। ভাবজগতের উর্ধ্বলোকে সুফি কবি হ্যরত হাফেজ সিরাজী (র.)-এর দর্শনকে অনুধাবনেও এই গ্রন্থ পরিপূর্ণভাবে সহায়ক। কবি হফেজকে নিয়ে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যে আজো নানামুখী তর্ক-বিতর্কে রয়েছেন সাহিত্য গবেষকগণ। কিন্তু ‘বেলায়তে মোত্লাকা’র দৃষ্টিতে হাফেজকে অবলোকন করলে বিতর্কের আর কোনো অবকাশ থাকে না। সুফি কবিদের কবিতাও যে পরিত্র ইলহামপ্রসূত সে বিষয়েও বেলায়তে মোত্লাকা অধ্যয়ন করে নিশ্চিত হওয়া যায়। এই গ্রন্থের ভেতর থেকে একথার সমর্থনে একটি উদ্ধৃতি দেয়া চলে:

‘যেহেতু সুফিয়ায়ে কেরাম জিন্দা খোদা ও জিন্দা নবী এবং অলিগণ থেকে অন্তর জ্যোতির দ্বারা সত্য সংগ্রহ করে থাকেন। এই পদ্ধতি নিশ্চয় নির্ভুল বলে তাঁদের বিশ্বাস। তাই তারা কারো ভয়ে ভীত, প্রলোভনে মুক্ত বা বশীভূত হয় না। তারা কারো সম্মানের প্রত্যাশী নন।’ (বেলায়তে মোত্লাকা, ষোড়শ সংস্করণ, ২০১৭, ভাষা বাংলা, পৃ. ১১০)

এখানে তাই উদ্ধৃত করা চলে কবি হাফেজের সেই পরিত্র ভাবপ্রসূত কবিতা:

তা সাল্লাহ্ চে দৌলত দারাম এম্শব  
কে আমাদ নাগাহ আঁ দেলদারম এম্শব।

\* \* \*

কাশাদ নক্ষে ‘আনাল হক’ বর জমী খুন  
চু মন্দুর, আর কোশী বর দরম এম্শব  
যার অর্থ: ইয়া আল্লাহ্, কী সম্পদ আজ লাভ করলাম। হঠাৎ এই  
নিশীথে প্রিয়তমার আবির্ভাব! আজ যদি কেউ আমায় নিধন করে  
আমার শোণিত ধারাও মন্দুর হাল্লাজের মতো জমির উপর  
‘আনাল হক’ ছবি আঁকতে আঁকতে প্রবাহিত হবে। (অর্থাৎ আমি  
এখন আল্লাহুম্য হয়েছি)।

তিনি মুসলমানদের ভেতরও যে মাজহাবগত সম্প্রদায় রয়েছে  
তাও স্বীকার করতেন না। তাকে প্রশ্ন করা হলে তিনি কবিতায়  
জবাব দিয়েছিলেন :

না মানু হানফী, না মানু শাফী  
না মানু মজহাব হাস্বলী দারাম।  
মালেকী হাম না মানু মাগারে  
মজহাবে এশ কী দারাম।

যার অর্থ: আমি হানাফি, শাফী, মালেকি, হাস্বলি এসব মাজহাবের  
কোনোটারই অনুসারী নই। আমার একটিই ধর্ম তার নাম হচ্ছে  
‘প্রেম’। এই ধর্ম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম আমি জানি না। (মোহাম্মদ  
বরকতুল্লাহ্, পারস্য প্রতিভা, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, তৃতীয় সংস্করণ  
২০১৮, পৃ. ৯৯, ১০০)

অতএব আজ একথা বলা চলে, তাসাওউফের পথ সাধনা ও তুরিকার  
পথ। সব তুরিকারই মূল বার্তা প্রেম, মানবতা। যা ‘বেলায়তে  
মোত্লাকা’ গ্রন্থে সমৃচ্ছারিত হয়েছে। কবি হাফেজ সিরাজী (র.) এই  
পথেরই ভাবালোকের পথিক ছিলেন বলে বিশ্ববিশ্রিত কবি হিসেবে  
নয় একজন উচ্চস্তরের মধ্য যুগের সুফি কবি হিসেবে ‘বেলায়তে  
মোত্লাকা’ গ্রন্থে আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন।

### সহায়ক গ্রন্থাবলী:

১. সুফিতত্ত্ব/ইসলাম ধর্মের অতীন্দ্রিয়বাদীদের ইতিহাস, এ.জে.আরবেরি, অনুবাদ : শওকত হোসেন, অবসর প্রকাশনী, ১ম সংস্করণ, ২০১৮ ঢাকা।
২. পারস্য প্রতিভা, মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, তৃতীয় সংস্করণ ২০১৮, ঢাকা।
৩. হাফিজ ও বিস্ময়কর দিওয়ান, শামসুল আলম সাঈদ, অ্যার্ডন পাবলিকেশন, ১ম সংস্করণ, ২০১২ ঢাকা।
৪. আরবী কবি সাহিত্য ও সাহিত্যিক, জি. এম. মেহেরুল্লাহ  
নাহদা প্রকাশনী, ২য় সংস্করণ ২০১৪, ঢাকা।

# নারী জাতির মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ইসলাম

## ● আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইকবাল ●

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বিয়ের দেন-মোহরের মাধ্যমেও নারী অর্থ-সম্পদ লাভ করে থাকে এবং এই সম্পদের মালিক সে নিজেই হয়। আবার দেন-মোহর আদায় করাও স্বামীর উপর বাধ্যতামূলক। কাজেই দেন-মোহরের মাধ্যমে নিশ্চিত ভাবে নারী এক বিশাল অংকের সম্পদের মালিক হয়। এতে অন্য কেউ অংশীদার বা দাবীদার হয় না। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন, “তাদের মধ্যে যাদের সাথে তোমরা সহবাস করবে তাদের নির্ধারিত দেন-মোহর ফরয হিসেবে প্রদান করবে”- (সূরা আন নিসা:৪:২৪)। “তাদের (স্ত্রী) একজনকে যদি অগাধ অর্থও দিয়ে থাক, তবুও তা হতে কিছুই ফেরত গ্রহণ করবে না”- (সূরা আন নিসা:৪:২০)। “তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের যা প্রদান করেছ তন্মধ্য থেকে কোন কিছু গ্রহণ করা তোমাদের জন্য হালাল নয়”- (সূরা বাকারা:২:২২৯)। “আর যদি তারা খুশি হয়ে তা হতে কিছু অংশ ছেড়ে দেয় তবে তা তোমরা স্বাচ্ছন্দে ভোগ করতে পারো”- (সূরা নিসা:৪:৮)।

হ্যরত উকবাহ ইবন আমির (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূল (দঃ) বলেছেন, “সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শর্ত যা অবশ্যই পূরণ করতে হবে- তা হচ্ছে সে শর্ত যার মাধ্যমে তোমরা (স্ত্রীদের) লজ্জাস্থান বৈধ করে নিয়েছো”- (সহিহ মুসলিম, হাদিস নং- ৩৩৩৭ ই.ফা., সহিহ বুখারী, হাদিস নং- ৪৭৭৪ ই.ফা.)। সাইদ ইবন মুসায়্যাব (রাঃ) হতে বর্ণিত, হ্যরত উমর ইবনুল খাতাব (রাঃ) ফায়সালা দিয়েছেন যে, “কোন মহিলাকে কোন পুরুষ বিয়ে করলে এবং বিয়ের পর (স্বামী-স্ত্রী গ্রহাভ্যন্তরে প্রবেশ করার পর) পর্দা টাঙ্গান হলে তবে স্বামীর উপর মোহর ওয়াজিব হবে”- (মুয়াত্তা ইমাম মালেক, হাদিস নং- ১০৯৪)। “যে ব্যক্তি নির্দিষ্ট দেন-মোহর ধার্য পূর্বক কোন নারীকে বিয়ে করে অথচ আল্লাহ জানেন যে, সে প্রকৃতপক্ষে দেন-মোহর আদায় করবে না, এমতাবস্থায় সে আল্লাহর সাথে প্রতারণা করলো, তার স্ত্রীকে হালাল করার চুক্তি বাতিল করলো এবং সে কিয়ামতের দিন একজন ব্যভিচারী হিসেবে উপস্থিত হবে”- (মাজমাউয যাওয়াইদ ও মাঘাউল ফাওয়াইদ, ফিকহস সুন্নাহ)।

এই আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় প্রত্যেক বিবাহিত পুরুষের উপর তার স্ত্রীর দেন-মোহর আদায় করা অবশ্য কর্তব্য। আর এর মাধ্যমে নারী কিছু অর্থ-সম্পদের মালিক হয়, যা তার একান্ত নিজের। তবে এখানে একটি প্রশ্ন থেকে যায় যে, এই দেন-মোহরের পরিমাণ কত হবে? এর উত্তর হলো- ইসলামী

শরিয়ত এ ব্যাপারে কোন নির্দিষ্ট সীমা নির্ধারণ করে নি। এর কারণ- পাত্র-পাত্রী ধর্মীও হতে পারে আবার গরীবও হতে পারে।

আবার প্রত্যেকের নিজস্ব

কৃষ্ণ-আদত-অভ্যাস-ঐতিহ্য-সংস্কৃতি থাকতে পারে। তাই দেন-মোহরের নির্দিষ্ট সীমা ঠিক না করে তা প্রত্যেকের নিজ নিজ অবস্থার উপর ভিত্তি করে নিজ নিজ সাধ্য ও ক্ষমতার উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। তবে স্থায়ী মূল্য আছে এমন কিছুই মোহর হিসেবে দেওয়া উচিত। তা কম হোক বা বেশি, যদি তাতে উভয় পক্ষ রাজি থাকে। এমন কি পবিত্র ‘কুরআন শিক্ষা দেওয়া’ও মোহর হতে পারে।

হ্যরত আমের বিন রবিয়া হতে বর্ণিত, বনু ফায়ারার জনৈক মহিলা এক জোড়া জুতাকে মোহর হিসেবে গ্রহণ করে বিয়ে করে। রাসূল (দঃ) বললেন, তুমি কি এক জোড়া জুতার বিনিময়ে নিজেকে সমর্পণ করতে সম্মত হয়েছ? সে বলল, হ্যাঁ। রাসূল (দঃ) তাকে অনুমতি দিলেন। (আহমদ, ইবন মাজাহ, হাদিস নং- ১৮৮৮, তিরমিয়ি, হাদিস নং- ১১১৩)

হ্যরত সাইল বিন সাদ থেকে বর্ণিত, জনৈক মহিলা রাসূল (দঃ) এর নিকট এলো এবং বললো: হে রাসূল (দঃ), আমি নিজেকে আপনার নিকট সমর্পণ করলাম। এরপর সে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে রইল। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো: হে রাসূল (দঃ)! এই মহিলা যদি আপনার প্রয়োজন না থাকে, তবে ওকে আমার সাথে বিয়ে দিন। রাসূল (দঃ) বললেন, ওকে মোহর দেয়ার মতো কিছু তোমার কাছে আছে কি? সে বলল, আমার কাছে আমার এই পরিধেয় বস্ত্র ছাড়া আর কিছু নেই। রাসূল (দঃ) বললেন, তুমি যদি তোমার পরিধেয় বস্ত্র ওকে দিয়ে দাও, তাহলে তুমি তো বিনা পরিধেয় বস্ত্রতেই বসে থাকবে। কাজেই অন্য কিছু যোগাড় করে নিয়ে এসো। সে বলল, আমি আর কিছু পাই না। রাসূল (দঃ) বললেন, খুঁজে দেখ, এমনকি লোহার একটা আংটিও যদি পাও। অতঃপর সে খুঁজে দেখলো। কিন্তু কিছুই পেল না। রাসূল (দঃ) বললেন, তোমার কাছে কি কুরআনের কিছু আছে? সে বলল, জ্ঞি, অমুক সূরা। রাসূল (দঃ) বললেন, ঠিক আছে, তোমার যেটুকু কুরআন জানা আছে তার (সেটুকু শিক্ষা দানের) বিনিময়ে তোমাদের দু'জনের বিয়ে সম্পাদন করলাম। (সহিহ বুখারী, হাদিস নং- ৪৭৭২, ই.ফা ও সহিহ মুসলিম, হাদিস নং-৩৩৫২)

হ্যরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (দঃ) বিশটি আয়াত স্থির করলেন। হ্যরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, আবু তালহা হ্যরত উম্মে সুলাইমকে বিয়ের প্রস্তাৱ

দিলো। উম্মে সুলাইম বললেন, আল্লাহর কসম, আপনার মতো লোককে প্রত্যাখ্যান করা যায় না। কিন্তু আপনি কাফের আমি মুসলমান। আপনাকে বিয়ে করা আমার জন্য বৈধ নয়। তবে আপনি যদি ইসলাম গ্রহণ করেন, তবে সেটাই আমার মোহর। এছাড়া আমি আপনার কাছে আর কিছু চাই না। অতঃপর ওটাই তার মোহর হলো। (ফিকহস সুন্নাহ)

এ থেকে বুঝা যায় যে কোন সামান্য জিনিসকেও মোহর হিসেবে ধার্য করা যায়। এমনকি কোন সেবামূলক কাজকেও মোহর হিসেবে ধার্য করা যায়। কুরআন শিখানো একটা সেবামূলক কাজ। বস্তুত মোহর স্তুর উপকারের জন্যই তার প্রাপ্য হিসেবে ধার্য হয়েছে। তাই আবু তালহা ইসলাম গ্রহণ করলে তার দ্বারা যে উপকার পাওয়া যাবে তাকেই উম্মে সুলাইম মোহর হিসেবে মেনে নিয়েছেন এবং তার বিনিময়ে নিজেকে তার নিকট সমর্পণ করেছেন। তবে ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এর মতে দশ দিরহাম এবং ইমাম মালেকের মতে, তিনি দিরহামের কম হলে মোহর আদায় হবে না। আর বেশির কোন সীমা নেই। বর্ণিত আছে, হ্যারত উমর (রা.) মিস্বরে দাঁড়িয়ে চারশো দিরহামের চেয়ে বেশি মোহর ধার্য করতে নিষেধ করেছিলেন। এরপর তিনি মিস্বর থেকে নামমাত্র জনৈক কুরাইশী মহিলা তার কাছে আসেন এবং প্রতিবাদ করে বলেন, আপনি কি কুরআনের এ আয়াত পড়েননি, “যদি তোমরা তোমাদের কোনো স্ত্রীকে বিপুল পরিমাণ সম্পদও দিয়ে থাকো, তবে তার কোন অংশ ফেরত নিওনা” (সূরা নিসা: ৪:২০)। হ্যারত উমর (রা.) তৎক্ষণাত্ম বললেন, “হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করো। সবাই উমরের চেয়ে বেশি ফিকাহ জানে”। এরপর তিনি মসজিদে ফিরে গেলেন এবং মিস্বরে আরোহণ করে বললেন, “আমি তোমাদেরকে চারশো দিরহামের চেয়ে বেশি মহর দিতে নিষেধ করেছিলাম। এখন বলছি যে, কোন ব্যক্তি তার সম্পত্তি থেকে যতো খুশি দিতে পারে। (সাইদ বিন মনসুর, আবু ইয়ালী)

ইসলাম ধর্মে বিয়ের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে, সাথে সাথে নারীর অধিকারের বিষয়েও দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে, যাতে সবাই হালাল উপায়ে জৈবিক চাহিদা পূরণ করতে পারে। তাই দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পক্ষে যাতে বিয়ে করা সহজ হয়, সে জন্য ইসলাম মাত্রাতিরিক্ত মোহর নির্ধারণকে অপছন্দ করেছে। হ্যারত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (দ.) বলেছেন, “যে বিয়েতে যতো কম ব্যয় সে বিয়ে ততোই বরকতময়।” (ফিকহস সুন্নাহ)। তিনি আরো বলেন, “নারীর সৌভাগ্য তার মোহর কম হওয়া, বিয়ে সহজ হওয়া এবং চরিত্র মাধুর্যে নিহিত। আর তার দুর্ভাগ্য তার মোহরের পরিমাণ বৃদ্ধিতে, বিয়ের জটিলতায় ও চরিত্রের কদর্যতায়।” (ফিকহস সুন্নাহ)

### অসিয়ত মোতাবেক প্রাঙ্গ সম্পত্তি ও নারী

পিতা চাইলে তার কন্যার জন্য কিছু সম্পদ অসিয়ত করতে পারে। তবে তা অবশ্যই এক-তৃতীয়াংশের বেশি হবে না। আল্লাহ তায়ালার বাণী- “মৃত ব্যক্তির অসিয়তের দাবি পূরণ ও ঝগ পরিশোধের পর”- (সূরা নিসা : ৪:১১-১৪)। হ্যারত সাঁদ ইবন আবু ওয়াককাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, “নবী (দ.) একবার আমাকে রোগাক্রান্ত অবস্থায় দেখতে আসেন। সে সময় আমি মকায় ছিলাম। কোন ব্যক্তি যে স্থানে থেকে হিয়রত করে সেখানে মৃত্যুরবণ করাকে তিনি অপছন্দ করতেন। এজন্য তিনি বলতেন, আল্লাহ রহম করুন ইবনু আফরা-এর উপর। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (দ.)! আমি কি আমার সমুদয় মালের ব্যবহারের অসিয়ত করে যাব? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, তবে অর্ধেক? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, তবে এক-তৃতীয়াংশ? তিনি বললেন, (হ্যাঁ) এক-তৃতীয়াংশ, আর এক-তৃতীয়াংশও অনেক। ওয়ারিসগণকে দরিদ্র পরমুখাপেক্ষী করে রেখে যাবার চেয়ে ধনী অবস্থায় রেখে যাওয়া উত্তম। তুমি যখনই কোন খরচ করবে, তা সদকারূপে গণ্য হবে। এমনকি সে লোকমাও যাতোমার স্তুর মুখে তুলে দিবে। হ্যাত আল্লাহ তায়ালা তোমার মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন এবং লোকেরা তোমার দ্বারা উপকৃত হবেন, আবার কিছু ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সে সময় তার একটি মাত্র কন্যা ব্যতীত কেউ ছিল না”- (সহিহ বুখারী, হাদিস নং- ২৭৪২)।

### হিবার মাধ্যমে প্রাঙ্গ অর্থ-সম্পদ ও নারী

‘হিবা’ আরবি শব্দ যার অর্থ দান, বখশিশ, অনুদান ইত্যাদি। সাধারণত বড় যখন ছোটকে কোন কিছু কোন লাভ বা মুনাফা ছাড়া দান করে তাকে হিবা বলা হয়। হিবা শব্দটি একটি বিশেষ পরিভাষা। ফিকহ এর পরিভাষায় এক ব্যক্তি কর্তৃক তৎক্ষণিকভাবে এবং কোন প্রকার বিনিময় গ্রহণ না করে স্বীয় কোন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি মালিকানা অন্য কাউকে একেবারে অর্পণ করাকে হিবা বলে।

কোন সম্পদ হিবা করতে হলে তা অবশ্যই- ১. দাতার বৈধ মালিকানাধীন হতে হবে, ২. তা বিদ্যমান থাকতে হবে, ৩. তা জানা থাকতে হবে, ৪. (হিবা করা বস্তু বা সম্পদ) হিবা না করা বস্তু বা সম্পদ হবে পৃথক, ৫. যদি একাধিক মালিক থাকে তবে প্রত্যেকের অংশ নির্দিষ্ট হতে হবে, ৬. দাতার দখলে থাকতে হবে, ৭. আর্থিক মূল্য থাকতে হবে, ৮. শরিয়তের দ্রষ্টিতে তা ক্রয় বিক্রয় ও বহন করার ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ থাকবে না, ৯. মালিকানা হস্তান্তরযোগ্য হতে হবে এবং ১০. কোন লেনদেনের কাজে নিয়োজিত থাকবে না। (চলবে)

## শিশু-কিশোর মাহফিল

# সত্যবাদিতা : মানুষের অনুপম চরিত্রের একটি শ্রেষ্ঠ গুণ

প্রিয় সোনালী বন্ধুরা! আমরা জানি যে, মহান আল্লাহ আমাদের সবার স্বষ্টা। তিনিই আমাদের মালিক ও রিয়াকদাতা। মহান আল্লাহর নিরানবইটি নাম রয়েছে। এগুলোকে ‘আসমাউল হুসনা’ বা সুন্দর সুন্দর নামসমূহ বলা হয়। এই নামগুলোর মধ্যে একটি নাম হলো ‘আল হক’। এর অর্থ হলো ‘সত্য’। অর্থাৎ মহান আল্লাহই হলেন ‘সত্য’। মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সত্যবাদি হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে কি বলেছেন জানো বন্ধুরা? মহান আল্লাহ সুরা ইউনুসে বলেন, “আল্লাহই সত্য পথ প্রদর্শন করেন”। তিনি সুরা আহযাবে আরো বলেন, “মহান আল্লাহ সত্যবাদিদেরকে তাদের সত্যবাদিতার জন্য প্রতিদান দেন”।

### সত্যবাদিতা সম্পর্কে আল্লাহর

#### প্রিয় হাবীব (দ.) কি বলেছেন?

আল্লাহর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- আমাদের কথায় ও কাজে সত্যবাদী হতে নির্দেশ দিয়েছেন। এমনকি যখন আমরা কারো সাথে মজা করব তখনও সত্যবাদী হতে হবে। একবার প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবী হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আমেরের (রাদিয়াল্লাহু আনহ) সাথে বসেছিলেন। এমন সময় হ্যরত আবদুল্লাহর মাতা তাঁকে ডাকলেন এবং বললেন, “আবদুল্লাহ! এই দিকে আস আমি তোমাকে কিছু দিতে চাই”। তখন আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হ্যরত আবদুল্লাহর মাতাকে জিজ্ঞেস করলেন, “হে আবদুল্লাহর মাতা! আপনি তাকে কি দিতে চান? তিনি উত্তর দিলেন, “আমি তাকে কিছু খেজুর দিতে চাই”। আল্লাহ হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, “আপনি যদি তাকে কিছু না দেন, তবে এটা আপনার আমলনামায় একটি মিথ্যা হিসেবে লিখা হবে”। (আবু দাউদ) তাই বন্ধুরা! আমাদের দুষ্টুমী করেও মিথ্যা বলা উচিত নয়।

#### সত্যবাদিতার পুরস্কার কি?

এবার চলো আমরা জেনে নিই সত্যবাদিতার পুরস্কার কি? হ্যরত আবু উমামা (রাদিয়াল্লাহু আনহ) হতে বর্ণিত আছে, আল্লাহর প্রিয় মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি তামাশার ছলেও মিথ্যা বলে না আমি তার জন্য জাল্লাতের মাঝখানে এইটি ঘরের জিম্মাদার”। (আবু দাউদ) বন্ধুরা! আমরা যদি জাল্লাতের মাঝখানে একটি সুন্দর প্রাসাদ লাভ করতে চাই তাহলে আমাদের সব সময় সত্য কথা বলতে হবে।

#### আমরা সত্যবাদী কেন হবো?

সোনালী বন্ধুরা! আমরা কেন সত্যবাদী হবো? হ্যাঁ, আমরা মহান আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নির্দেশ মেনে সত্যবাদী হবো, সেটা ঠিক আছে। কিন্তু সত্যবাদী হওয়া যে আমাদের জীবনের প্রতিটি মূল্যেই

প্রয়োজন, তা কি তোমরা চিন্তা করেছো? আচ্ছা, তোমার পরিবারের বড় কেউ যদি তোমাকে কোন উপহার দিবে বলে এবং পরে তা না দেয়, তবে তোমার কেমন লাগবে? যদি তোমার কোন বন্ধু তোমাকে কিছু দিবে বলে পরে তা আর না দেয়, তবে তোমার কেমন লাগবে? নিশ্চয়ই খারাপ লাগবে এবং তুমি তাকে আর বিশ্বাস করবে না। ঠিক তেমনি, তুমিও যদি কারো সাথে কোন মিথ্যা কথা বল বা ওয়াদা ভঙ্গ কর তবে তোমাকেও আর সে বিশ্বাস করবে না। তাই সব সময় সত্য কথাই বলতে হবে।

বন্ধুরা! তোমরা তো সেই রাখাল ও নেকড়ের গল্পটা শুনেছ। তবুও আবার একটু মনে করিয়ে দিই। এক রাখাল প্রতিদিন মাঠে মেষ ঢ়াতে যেত। মাঠের পাশেই ছিল জঙ্গল। সে জঙ্গলে থাকত বড় বড় সব নেকড়ে। সুযোগ পেলেই তারা মেষপালের উপর হামলা করতো। একদিন সেই রাখাল মেষপাল চড়াতে নিয়ে গেল মাঠে। হঠাৎ তার মনে এক দৃষ্ট বুদ্ধি আসল। সে জোরে চিংকার করা শুরু করলো, “নেকড়ে, নেকড়ে, আমার মেষ নিয়ে গেল”。 তার চিংকার শুনে আশেপাশের অন্যান্য রাখাল আর গ্রামবাসী দৌড়ে আসল তাকে সাহায্য করার জন্য। কিন্তু সবাই এসে দেখল রাখালের কথা মিথ্যা, সে সবার সাথে মজা করেছে। এর কিছুদিন পর সে রাখাল আবার একই কাজ করল। এবারো সবাই এসে দেখল সে রাখাল ছেলেটি মিথ্যা বলেছে। এদিকে রাখাল অনেক খুশি হলো, কারণ সে সবাইকে বোকা বানিয়েছে। একদিনের ঘটনা, সেদিন সত্য সত্য নেকড়ে আসল। নেকড়ের দল তার মেষপালে হামলা করলো। রাখাল ছেলেটি আবার চিংকার করলো, “নেকড়ে, নেকড়ে, আমার মেষ নিয়ে গেল”。 কিন্তু এবার কেউ তার কথা আর বিশ্বাস করলো না। সবাই ভাবল সে মজা করছে। কেউ তাকে সাহায্য করতে গেল না। এবার রাখালের বুক হলো যে, সে কতবড় অন্যায় করেছে এবং নিজের বিপদ নিজেই ডেকে এনেছে।

সুতরাং বন্ধুরা আমরা সব সময় সত্যবাদী থাকব আর কখনো মিথ্যা কথা বলব না। এতে আমাদের উপর সবার আস্থা-বিশ্বাস থাকবে এবং আল্লাহ ও তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশও মানা হবে।

ও, বন্ধুরা! আরো একটা বিষয়, সত্য কথা বললে নিজের আস্থাও প্রশান্তি লাভ করে। আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “সত্যবাদিতা চিন্তকে প্রশান্ত করে”।

“সত্য মুক্তি দেয়, মিথ্যা ধ্বংস করে”- এই কথাটিও আমরা সবসময় স্মরণ রাখব বন্ধুরা। মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও হজুর গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) এর উসিলায় আমাদের সত্যবাদী হওয়ার তৈরিক দান করুণ। আমিন।

# ফীহি মা ফীহি

## (মওলানা রামীর উপদেশ বাণী)

### ● অনুবাদক: কাজী মোহাম্মদ সাইফুদ্দিন ●

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কুরআন-শিক্ষকের কাছে আমি এভাবেই বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছিলাম, কিন্তু' তাতে (তাঁর মনের মধ্যে) কোনো ছাপ না পড়ায় আমি তাঁকে যেতে দেই।

বর্ণিত আছে যে মহানবী (দঃ)-এর যুগে কেউ একটি বা আধখানা সূরা মুখস্থ জানলেই বিজ্ঞ বলে আখ্যায়িত হতেন এবং তাঁকে দেখিয়ে বলা হতো, “ইনি একখানা সূরা মুখস্থ জানেন।” কেননা, ওই জমানায় তাঁরা কুরআন মজীদকে গোথাসে গিলতেন। এক বা দুই টুকরো রূটি গোথাসে গেলা অবশ্যই একটি বড় অর্জন। কিন্তু' যে সব মানুষ না চিবিয়ে রূটি মুখে পুরে এবং আবার উগলে ফেলে, তারা ওইভাবে সহস্র সহস্র টন গোথাসে গিলতে সক্ষম।

তবু এটি একটি ভালো বিষয়। আল্লাহতালা কিছু লোকের চোখগুলোতে মোহর মেরে দিয়েছেন যাতে তারা এই বর্তমান জগতকে আবাদ করতে পারে। যদি পরকালের ব্যাপারে কেউই অঙ্গ না হতো, তাহলে এই জগতটি শূন্যতায় ভরে যেতো। এই অঙ্গত্ব-ই সংস্কৃতি ও প্রগতি তুরান্বিত করে থাকে। শিশুদের কথাই ধরুন, তারা বেপরোয়াভাবে বেড়ে ওঠে এবং লম্বা হয়, কিন্তু' যখন বিচার-বুদ্ধিতে তারা পরিণত হয়, তৎক্ষণাত্ম তাদের বেড়ে ওঠা বন্ধ হয়ে যায়। অতএব, সভ্যতার কারণ হচ্ছে অঙ্গত্ব, আর ধ্বংসের কারণ দৃষ্টিশক্তি।

আমি যা বলছি তা দুটি বিষয়ের যে কোনো একটি দ্বারা প্রণোদিত: হয় আমি ঈর্ষার দরূন এ কথা বলছি, নতুবা করণাহেতু। ঈর্ষা হতে আল্লাহ মাফ করুন! যাঁরা ঈর্ষা পাওয়ার যোগ্য তাঁদেরকে তা করাও আহাম্মকি; এমতাবস্থায় যে ব্যক্তি ঈর্ষা পাওয়ার যোগ্য নয়, তাকে কীভাবে তা করা যায়? না, আমি মহা করণার দরূন এ কথা বলছি, কেননা আমি আপনাদেরকে (ঐশ্বী বাণীর) প্রকৃত অর্থের দিকে আকৃষ্ট করতে চাই।

এক হজ্জ্যাত্রীর কাহিনী হলো, তিনি পথ চলতে পানির তেষ্টায় মরণভূমিতে পড়ে গিয়েছিলেন। হঠাতে তিনি কিছুটুকু দূরে একটি ছেট ও ছেঁড়া তাঁবু দেখতে পান। অনেক কষ্টে নিজেকে টেনে সেখানে পৌঁছে এক যুবতীকে দেখে তিনি চিন্তকার করে বলেন, “আমি মেহমান! আমি আমার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে গিয়েছি!” এ কথা বলে তিনি বসে পড়েন এবং পানি পান করতে চান। যুবতী পানি নিয়ে আসে, যা আগুনের চেয়েও গরম ছিল এবং লবণের চেয়েও বেশি লোনা। ঠোঁট হতে গলা পর্যন্ত শরীরের

সমস্ত অংশ-ই এটি পুড়িয়ে দেয়। ওই হজ্জ্যাত্রী সীমাহীন অনুগ্রহের নির্দশন হিসেবে যুবতীকে বলেন:

“মা, তুমি আমাকে যে স্বত্তি দিয়েছো, তার জন্যে আমি তোমার কাছে ঝণী। আমার মধ্যে অনুগ্রহ উথলে ওঠেছে। আমি যা বলি, তা মন দিয়ে শোনো। দেখো, বাগদাদ কাছে ধারেই আছে, আরো আছে কুফা, ওয়াসিত এবং বাকি সব নগরী। সেসব জায়গায় তুমি অনেক মিষ্ট স্বাদের শীতল জল পাবে; এছাড়াও পাবে বিভিন্ন ধরনের খাবার, গোসলখানা, আরাম-আয়েশের সমৃদ্ধ উপকরণ।” অতঃপর তিনি ওইসব শহরের আনন্দ-বিনোদনের বিস্তারিত বিবরণ দেন।

এক মুহূর্ত পরই ওই নারীর স্বামী বেদুঈন লোকটি দৃশ্যপটে আবির্ভূত হয়। সে বেশ কিছু মরু-ইন্দুর ধরে এনেছিল যেগুলো সে স্ত্রীকে রাঁধতে বলে। ওই মেহমানকে তারা এর মধ্যে কয়েকটি খাওয়ার জন্যে সাধে, যা মরিয়া অবস্থার কারণে তিনি খেতে বাধ্য হন। অতঃপর মধ্যরাতে মেহমান তাঁবুর বাইরে ঘূরিয়ে পড়লে যুবতী নারী তার স্বামীকে বলে:

“আমাদের মেহমান যেসব কাহিনী বলেছেন তা কি তুমি শুনেছো?” এরপর সে সমস্ত বৃত্তান্ত তার স্বামীকে খুলে বলে। বেদুঈন লোকটি উত্তর দেয়, “এসব কাহিনীতে কর্ণপাত করো না। পৃথিবীতে অনেক ঈর্ষাপরায়ণ মানুষ আছে। তারা কাউকে আরামে ও প্রাচুর্যে জীবনযাপন করতে দেখলে ঈর্ষাবোধ করে এবং তাকে এই সৌভাগ্য হতে বন্ধিত করার অভিপ্রায়ে ভবঘুরে বানাতে চায়।”

বহু মানুষেরই এই একই অবস্থা। কেউ যখন স্বে অনুগ্রহবশতঃ তাদেরকে কোনো উপদেশ দেন, তারা এটিকে ঈর্ষা হিসেবে দেখে থাকে। কিন্তু' যদি কারো মধ্যে (মূল) শেকড় প্রোথিত থাকে, তাহলে তারা শেষমেশ সত্যমুখি হবেই। যদি আদি প্রতিশ্রুতি দিবস (আল্লাহ যেদিন জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমি কি তোমাদের প্রভু নই?) প্রিয় বান্দাবন্দ উত্তরে বলেছিলেন, জিঃ হ্যাঁ) হতে তাদের ওপরে এক বিন্দু-ও ছিটানো হয়ে থাকে, তাহলে চূড়ান্ত পর্যায়ে ওই এক বিন্দু-ই তাদেরকে বিভ্রান্তি ও দুঃখকষ্ট হতে মুক্তি দেবে। অতএব, আসুন! কতো সময় আর আপনারা আমাদের থেকে দূরে অবস্থান করবেন এবং আমাদের ব্যাপারে অপরিচিত অবস্থায় থাকবেন? কতোদিন বিভ্রান্তি ও দুঃখে দিন কাটাবেন? এরকম কাহিনী যেসব লোক ইতিপূর্বে শোনেনি, এমন কি তাদের শিক্ষকদের কাছেও নয়, তাদেরকে আমরা কী-ই বা বলবো?

শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য যেহেতু তাদের পূর্বসূরীদের সভায় শোভা পায়নি, সেহেতু তারাও মহান ব্যক্তিত্বদের প্রশংসাকে সহজে করতে পারে না।

প্রথম সাক্ষাতে সত্যের মুখোমুখি হওয়ার আকর্ষণ না থাকলেও কেউ তা যতো দীর্ঘক্ষণ অনুসরণ করে, ততোই তা মিষ্টিস্বাদে পরিণত হতে থাকে। এটি সেই বাহ্যিক আকৃতির ঠিক উল্টো, যেটি প্রথম প্রথম মুক্ত করলেও যতো দীর্ঘক্ষণ আপনি তার সান্নিধ্যে বসে এ কথা ভাববেন যে এ-ই তো সব কিছু, ততোই আপনি হিমশীতল পরশ অনুভব করবেন। আল-কুরআনের আকারটি তারই অর্থের তুলনায় কেমন? কোনো পুরুষ অথবা নারীকে পরীক্ষা করুন: তাদের আকৃতি তাদের অর্থের তুলনায় কেমন? ওই নারী বা পুরুষের বোধশক্তি যদি বিলুপ্ত হয়, তবে আমরা তাকে আমাদের বাড়িতে এক মুহূর্তের জন্যেও মুক্তভাবে চলতে-ফিরতে দেবো না।

আমাদের শায়খ (পীর ও মোরশেদ) হ্যরত শামস-এ-তাবরিয়ী (রহ.) একবার একটি কাহিনী বর্ণনা করেন যা নিম্নরূপ: কোনো দূরবর্তী শহরের উদ্দেশ্যে একটি বিশাল কাফেলা রওয়ানা হয়েছিল। পথে তারা একটি নির্দিষ্ট জায়গায় এসে পৌঁছলো, যেখানে ছিল না কোনো বসতির চিহ্ন, অথবা জল। হঠাৎ তারা একটি কুয়োর সামনে উপস্থিত হয় যাতে কোনো বালতি-ই ছিল না। এমতাবস্থায় তারা একটি কেটলি ও কিছু দড়ি জোগাড় করে কেটলিখানি কুয়োর ভেতরে নামিয়ে দেয়। দড়িতে টেনে তোলার সময় কেটলির দড়ি ছিঁড়ে যায়। তারা এরপর আরেকটি কেটলি পাঠায়, কিন্তু ‘তা-ও ছিঁড়ে পড়ে যায়। অতঃপর তারা কাফেলার লোকদেরকে দড়ি দিয়ে পেঁচিয়ে এক এক করে কুয়োর মধ্যে নামিয়ে দেয়, অথচ তারাও অদৃশ্য হয়ে যায়। ওই সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন এক মহা অন্তরের মানুষ। তিনি (সবাইকে) বলেন, “আমি নিচে যাবো।” তারা তাঁকেও নিচে নামিয়ে দেয়। তিনি যখন ঠিক কুয়োর তলদেশে পৌঁছেন, তখন হঠাৎ ভয়ঙ্কর একটি কালো জন্মতি আবির্ভাব ঘটে। ওই ব্যক্তি মনে মনে ভাবেন, “বাঁচতে তো আমি পারবো না, তবে অন্ততঃ নিজের বুদ্ধি ঠিক রেখে ছঁশ-আকুল না হারিয়ে মোকাবেলা করি, এর ফলে কী হতে যাচ্ছে তা আমি দেখতে পাবো।”

ঠিক সে সময় কালো জন্মতি তাকে বলে, “লম্বা কাহিনী ফেঁদে বসো না, এক্ষণে তুমি আমার বন্দী। আমার প্রশ্নের সঠিক উত্তর না দেয়া পর্যন্ত তুমি ছাড়া পাবে না। কেউই তোমাকে এখন আমার হাত থেকে বাঁচাতে পারবে না।” ওই ব্যক্তি বলেন, “প্রশ্ন জিজ্ঞেস করুন।” জন্মতি প্রশ্ন করে, “(পৃথিবীতে) সেরা স্থান কোনটি?”

বন্দী ওই ব্যক্তি ভাবেন, “আমি তো বন্দী এবং অসহায়। যদি বাগদাদ বা অন্য কোনো জায়গার নাম বলি, তাহলে হয়তো

তার নিজস্ব শহরকে অপমান করতে পারি।” অতঃপর ওই ব্যক্তি উচ্চস্বরে বলেন, “সেরা জায়গা হলো সেটি, যেখানে আমরা বসবাস করতে স্বত্ত্ব অনুভব করি। তা মাটির অভ্যন্তরে হলেও সেরা স্থান, আর ইন্দুরের গর্তে হলেও তা-ই।” উভর শুনে জন্মতি চিৎকার করে বলে, “ভালো বলেছো, খুবই ভালো বলেছো! তুমি বেঁচে গেলে। দশ লাখে একজন তুমি। এক্ষণে আমি তোমায় মুক্ত করে দিচ্ছি, আর তোমারই কল্যাণে অন্যদেরও মুক্তি দিচ্ছি। এর পর থেকে আমি আর কখনো রক্তপাত করবো না। তোমার প্রতি মহুরতের কারণেই পৃথিবীবাসীর প্রতি আমার এই উপহার।”

অতঃপর জন্মতি কাফেলার লোকদেরকে তাদের চাহিদা পূরণের জন্যে জলপান করতে দেয়। এই কাহিনীর উদ্দেশ্য লুকোনো রয়েছে এর অন্তর্নিহিত অর্থে। আমরা একই অর্থ আরেকটি আকৃতিতে বর্ণনা করতে পারি, কিন্তু ‘ঐতিহ্যবাহী আকার-আকৃতির ভক্তবৃন্দ এই সংস্করণটি-ই পছন্দ করবেন। তাদের সাথে কথা বলা (মানে বোঝানো) বেশ দুরহ ব্যাপার। আমরা এই একই কথা আরেকটি রূপকের সাহায্যে বর্ণনা করলে তারা শুনতে রাজি হবেন না। (চলবে)

## সুফি উদ্ধৃতি

- যখন দেখবে তোমার মধ্যে কারো সঙ্গে শক্তির ভাব ও বাগড়া-কলহের কোন স্পৃহা নাই, তখন বুঝবে যে, তোমার মারিফাত হাসিল হয়েছে।
- অনন্ত সুখের আলয় বেহেশত সামান্য কয়েক দিনের আমল দ্বারা লাভ করা যায় না, তার জন্য কঠোর সাধনা এবং নেক নিয়তের প্রয়োজন।
- তোমার চিন্তা শক্তি তোমার জন্য একটি দর্পণস্বরূপ, তুমি তার সাহায্যে তোমার যাবতীয় নেক ও বদ কাজগুলো দেখতে পাবে।
- নির্জনতায় ও নিরবতায় যার মনে আল্লাহর মহিমা চিন্তা না হয়, তার সমস্ত নিরবতা ও নির্জনতা আল্লাহ তাঁয়ালা হতে উদাসীনতা এবং কামরিপু প্রসূত।
- যে ব্যক্তি আল্লাহকে চিনতে পেরেছে সে তাঁর সথে ভালবাসা-মহুরত স্থাপন করেছে। আর যে দুনিয়াকে চিনেছে সে দুনিয়ার মোহে মন্ত হয়েছে এবং খোদার সাথে শক্তি গড়ে তুলেছে।

- হ্যরত ইমাম হাসান বসরী (রা.)

# মাইজভাণ্ডারী দর্শনের আলোকে আত্মগুদ্ধ ব্যক্তি জীবন ও সমাজ

## • মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম •

কবি বলেছেন, তাঁর কাব্য ভাষায়-

“এমন জীবন তুমি করিবে গঠন,

মরিলে হাসিবে তুমি কাঁদিবে ভুবন।”

জীবন একটাই। পৃথিবীতে দ্বিতীয়বার আসার কোন সুযোগ নেই। তাই এই একটা জীবনকেই অর্থবহ করে তোলা মানুষের কাজ। আর অর্থবহ করতে গিয়ে নেতৃত্ব-অনৈতিক, ন্যায়-অন্যায় বিচার-বিবেচনা করে চলা বুদ্ধিমানের কাজ। কেননা ভুলে যাওয়া চলবেনা যে, আমাদেরকে পুনরায় ফিরে যেতে হবে শ্রষ্টার দিকে। হিসেব দিতে হবে জীবনের প্রতিটি কৃতকর্মের। অতএব আমরা পৃথিবীতে যাচ্ছতাই করতে পারিনা; যেনতেনভাবে জীবন পরিচালনা করতে পারিনা। আমাদের জীবন এমনভাবে পরিচালিত হওয়া চা-ই, যেভাবে পরিচালিত হলে দুনিয়ার জীবন গোছালো ও সৌন্দর্যমণ্ডিত হয় এবং পরকালেও উত্তম প্রতিদানের প্রাপ্তির আশা করা যায়। বস্তুত স্বয়ং আল্লাহ রাবুল আলামিনই আমাদেরকে তাঁর নিকট এইরূপ দুনিয়াবি এবং পরকালীন জীবন প্রার্থনা করার জন্য পবিত্র কোরআনে শিখিয়ে দিয়েছেন এভাবে- “হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়ায় কল্যাণ দান করুন এবং আখিরাতেও কল্যাণের অংশীদার করুন।”

আল্লাহ রাবুল আলামিন আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতের জীবন কেমন কাম্য হওয়া উচিত শুধু তা শিখিয়ে দিয়ে ক্ষত হননি বরং আমাদের দুনিয়াবি জীবন ‘কোন দর্শনের আলোকে পরিচালিত হলে তা কল্যাণকর হবে’- সেই পথেরখাও বাতলে দিয়েছেন পবিত্র কোরআনের সূরা ফাতিহাসহ আরও অসংখ্য সূরা-আয়াতে পাকে। সূরা ফাতিহার কথাই বলি- আল্লাহ রাবুল আলামিন বলেন, “ইহদিনাস সীরাত্তাল মুস্তাকিম। সীরাত্তাল লাযিনা আন ‘আমতা ‘আলাইহিম’- “আমাদেরকে সরল সঠিক পথে অটল রাখুন, তাঁদের পথে, যাঁদের আপনি অনুগ্রহ করেছেন।”

আল্লাহর নেয়ামতপ্রাপ্ত বান্দারা হলেন নবী, রাসূল, সিদ্দিকীন, শুহাদা, মুমিন, মুত্তাকী এবং আউলিয়া কেরাম, তাঁদের মত-পথে চললে মুক্তির সম্ভাবনা অবারিত থাকে। তাঁদের জীবন দর্শনের আলোকে জীবন পরিচালিত করলেই দুনিয়াবি কল্যাণ এবং পরকালীন কল্যাণ অর্জিত হয়। মূলত তাঁরাই হলেন পথ প্রদর্শক।

আজকে আমরা তেমনই একটি জীবন ‘দর্শন’ বিবেচনায় আনতে চাই, যে দর্শন কারো ব্যক্তিজীবনে যদি প্রতিফলিত হয় তবে ব্যক্তিজীবন হয়ে উঠবে কল্যাণময়; পারিবারিক জীবনে যদি প্রতিফলিত হয় তবে পারিবারিক জীবন হয়ে উঠবে সুখময়; যদি ধর্মীয়জীবনে প্রতিফলিত হয় তবে ধর্মীয় জীবন হয়ে উঠবে পুণ্যময়; যদি সামাজিক জীবনে প্রতিফলিত হয় তবে সমাজে পুনরায় ফিরে আসবে শান্তির আবহ; যদি

রাজনৈতিক জীবনে প্রতিফলিত হয় তবে দেশ হবে শৃঙ্খলাময়। সর্বোপরি যে দর্শনের আলোকে জীবন গঠিত হলে দুনিয়াবি ও পরকালীন জীবন হবে কল্যাণময়। ঠিক তেমনই একটি দর্শন হচ্ছে, “মাইজভাণ্ডারী দর্শন তথা ‘মাইজভাণ্ডারীয়া তুরিকা’র দর্শন”। এই তুরিকার প্রবর্তক আউলাদে রাসূল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়ালিহি ওয়াসাল্লাম, খাতেমুল আউলিয়া হজুর গাউসুল আয়ম হয়রাত মাওলানা শাহসুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (ক.)। আলোচ্য প্রবন্ধে মাইজভাণ্ডারী দর্শনে যে সকল বিষয় সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত সে সকল বিষয় নিয়ে যৎসামান্য আলোকপাত করা হলো।

**নৈতিকতা:** নৈতিকতা বলতে আমরা বুঝি নীতির অনুশীলন, ন্যায়ের চর্চা। সততা, সদাচার, সৌজন্যমূলক আচরণ, সুন্দর স্বভাব, সুকথা ও উন্নত চরিত্র- এ সবকিছুর সমন্বয়ই হল নৈতিকতা।

নীতিহীন মানুষ চতুর্স্পদ জন্মের চেয়েও নিকৃষ্ট। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন, “যাদের হৃদয় আছে কিন্তু তা দিয়ে উপলক্ষ করে না, চোখ আছে কিন্তু তা দিয়ে দেখে না, কান আছে কিন্তু তা দিয়ে শোনে না- এরা হল চতুর্স্পদ জন্মের মতো। বরং তার চেয়েও পথভ্রষ্ট” [সূরা আরাফः ৭: আয়াতাংশ ১৭৯]। সমাজে যত প্রকার অন্যায়, অবিচার, অশুলীলতা, বেহায়াপনা সংঘটিত হয় সেসব অপকর্ম শুধুমাত্র নীতিহারা মানুষের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। নৈতিক গুণাবলি সম্পন্ন ব্যক্তি কখনো কোন অন্যায় কাজ করেনা, নৈতিক শক্তির কারণে জাহাত বিবেকের তাড়নায় তা করা সম্ভবও নয়। তাই মাইজভাণ্ডারী দর্শন নৈতিক চরিত্রের উৎকর্ষতার প্রতি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব প্রদান করে। গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী (ক.) মানুষকে সব সময় নৈতিকতার দীক্ষা দিয়েছেন। তিনি মানুষকে বলতেন - “করুতরের মত বাহিয়া খাও, হারাম খাইওনা। নিজ সন্তান সন্ততি নিয়া খোদার প্রশংসা কর।”

**বিচারসাম্য:** বিচার ব্যবস্থার অসমতার কারণেই সমাজে যাবতীয় বিশ্বজ্ঞান-অনিয়ম দেখা দেয়। সুসম বণ্টনের অভাবে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান দিন দিন বেড়েই চলেছে। এ ব্যবধান বৃদ্ধির সাথে সাথে দরিদ্রগোষ্ঠীর প্রতি অন্যায়, অবিচার-জুলুমের মাত্রাও দিন দিন বেড়ে চলেছে। তাই সমাজ থেকে ধনী-দরিদ্রের ভারসাম্যহীন এই অবস্থা দূরীভূত করার লক্ষ্যে মাইজভাণ্ডারী দর্শন ‘আদলে মোতলক তথা বিচারসাম্য’র প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করে। এটিকে শুধুমাত্র লেখা ও কথাবার্তায় সীমিত না রেখে, বরং আক্ষরিক অর্থে সমাজের দুষ্ট-দরিদ্র মানুষগুলোকে স্বাবলম্বী করে বৈষম্যমূলক সমাজে পুনরায় ভারসাম্য ফিরিয়ে আনার জন্য প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে “শাহানশাহ সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) ট্রাস্ট”। এছাড়া দেশের প্রতিটি অঞ্চলে সংগঠিত ‘মাইজভাণ্ডারী

গাউসিয়া হক কমিটি'র শাখাসমূহ বৈষম্য দূরীকরণ ও দারিদ্র্য বিমোচনে স্বেচ্ছাসেবীর ভূমিকা নিয়ে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

### মানবিকতা: নজরগলের ভাষায়-

“আরতির থালা, তসবির মালা আসিবেনা কোন কাজে,  
মানুষ করিবে মানুষের সেবা, আর বাকি সব বাজে।”

মানুষের সেবায় আত্মনিরোগ করা মহাপুণ্যের কাজ। রাহমাতুল্লিল আলামিন রাসূল (দ.) জীবনের প্রতিটি ক্ষণেই মানুষের সেবা করেছেন, অলি আল্লাহগণ করেছেন। পরম্পরায় মাইজভাণ্ডারী দর্শনও মানবিকতার এই দীক্ষা দেয়। আউলাদে রাসূল (দ.) হজুর গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী অভাবী প্রতিবেশিদেরকে অকাতরে দান করতেন, রাতে ঘুমিয়ে থাকা খাদেম-কর্মচারীদের অবস্থা দেখতেন। এমনকি অনেক সময় তাদের মাথায় বালিশ না থাকলে নিজের গায়ের চাদর ঘুমন্ত খাদেমের মাথার নিচে দিয়ে দিতেন। মানবিকতার এর চেয়ে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আর কীই বা হতে পারে!

একবিংশ শতাব্দির এই যুগে এসে যেখানে সমাজের প্রতিটা পদে পদে মানবতা ভূলঁক্ষিত হচ্ছে সেখানে মাইজভাণ্ডারী দর্শনের প্রকৃত অনুসারীরা দিন দিন মানবতার খেদমতের আঞ্চাম দিয়ে যাচ্ছেন বৃহৎ থেকে বৃহত্তর পর্যায়ে। শাহানশাহ হ্যারত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) ট্রাস্ট এবং সারাদেশ জুড়ে মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি বাংলাদেশের শাখা কমিটিসমূহের সার্বিক কর্মকাণ্ডের দিকে তাকালেই এর বাস্তবতা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠে।

**আত্মনির্ভরশীলতা:** পরমুখাপেক্ষীতার কারণে মানুষের ব্যক্তিত্ব বিনষ্ট হয়। সমাজে অপমানজনক জীবনযাপন করতে হয়। ফলে অধিকাংশ সময় মানুষ অন্যায় কাজে লিঙ্গ হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে আত্মনির্ভরশীল মানুষ সমাজে ব্যক্তিত্ব নিয়ে সম্মানজনকভাবে মাথা উঁচু করে বসবাস করে। আত্মনির্ভরশীল হয়ে জীবন যাপন করার মহৎ শিক্ষা দিয়েছেন স্বয়ং নবিবর হ্যারত মোহাম্মদ মোস্তফা (দ.)। যা কবির ভাষায় ফুটে উঠেছে এভাবে-

“নবীর শিক্ষা করনা ভিক্ষা, মেহনত কর সবে।”

হজুর গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী (ক.) ও মানুষকে একই শিক্ষা প্রদান করেছেন। তাঁর এমনই একটি অমিয় বাণী হল- “নিজের হাতে পাকাইয়া খাও, পরের হাতে খাইও না।” বিশ্বালি শাহানশাহ হ্যারত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) মানুষকে কাজের প্রতি উৎসাহিত করে বলেন- “কাজের জন্য জগৎ জীবন ও আল্লাহ রাসূল (দ.)’র বিধান। ভাল কাজও ইবাদত। অলস হয়ে বেকার বসে থেক না।” এভাবে মাইজভাণ্ডারী মনীষীগণ মানুষকে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার শিক্ষা দিয়েছেন সময়ে। মহাঘৃত আল্ কোরআনেও আত্মনির্ভরশীল হওয়ার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য, মাইজভাণ্ডারী দর্শন ‘সপ্ত পদ্ধতি বা উসুলে সাবআ’র প্রথম

ধাপই হল ‘আত্মনির্ভরশীল হওয়া’।

**পরদোষ পরিহার:** অন্যের দোষ তালাশ করা আমাদের সহজাত অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে। অথচ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অপরের ছিদ্রাবেষণে মন্ত লোকদের কারণেই ব্যক্তি-ব্যক্তিতে, পরিবার-পরিবারে কলহ বিবাদের দানা বাঁধে। তাই মাইজভাণ্ডারী দর্শন ‘ন্যায়-নীতি বিরোধী যাবতীয় অপকর্মের প্রতিবাদ ছাড়া’ অপরের দোষ ত্রুটি তালাশ করতে নিষেধ করে এবং নিজের দোষ অনুসন্ধান করার প্রতি অধিক গুরুত্ব দেয়। এ প্রসঙ্গে হজুর গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী বলেন- “তোমরা বাহাস করিও না”; “করুতরের মত বাছিয়া খাও।” হজুর গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারীর শিখিয়ে যাওয়া নীতি-দর্শনকে তাঁর একমাত্র মনোনীত সাজ্জাদানশীল অছিয়ে গাউসুল আয়ম হ্যারত শাহসুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) কবিতায় রূপদান করে বলেন- “পরদোষ পরিহারে নিজ দোষ ধ্যানে।”

**অনর্থ পরিহার:** মাইজভাণ্ডারী দর্শনের আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হল ফলাফলশূন্য কাজ পরিহার করা। অপ্রয়োজনীয় কাজ এবং অপ্রয়োজনীয় কথার দরুণ বিভিন্ন ঝামেলার সৃষ্টি হয়। হজুর গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী সময়ে সময়ে বলতেন- “এখানে হাওয়া (অনর্থ) দাফন করা হইয়াছে।” অছিয়ে গাউসুল আয়ম হ্যারত শাহসুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) কাব্যিকরণে বলেন-

“অনর্থেরী পরিহারে তাকওয়ার ঝলক দেখেছি,  
পরগণেতে অলির পরণ পত্তা নির্দেশ দিতেছি।”

**উল্লেখ্য:** পরদোষ এবং অনর্থ পরিহার করা মাইজভাণ্ডারী দর্শন সপ্তকর্ম পদ্ধতির দ্বিতীয় ধাপ তথা ফানা আনিল হাওয়া।

**কু-প্রব্রত্তির বিনাশ:** মানুষের প্রব্রত্তি তথা ইচ্ছাশক্তি দুরকম হয়ে থাকে। সু-প্রব্রত্তি এবং কু-প্রব্রত্তি। এই দুই ইচ্ছাশক্তির মধ্যে যদি কু-প্রব্রত্তি কোন ব্যক্তির মাঝে অধিক প্রভাব বিস্তার করে তখন ঐ ব্যক্তি পাপ কাজে জড়িয়ে পড়ে। আর এর বিপরীত হলে ব্যক্তি পুণ্য কাজে জড়িয়ে পড়ে। মাইজভাণ্ডারী দর্শন মানব অন্তরে বিরাজিত কু-প্রব্রত্তির বিনাশ সাধন করে সু-প্রব্রত্তি তথা খোদার ইচ্ছা শক্তিকে প্রাধান্য দেওয়ার অনুশীলনের শিক্ষা দেয়। হজুর গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী মানুষকে বলতেন- “ফেরেশতা কালেব বনিয়া যাও।” অর্থাৎ ফেরেশতার ন্যায় খোদার হ্যাকুম মত কাজ কর।

**উল্লেখ্য:** কু-প্রব্রত্তির বিনাশ মাইজভাণ্ডারী দর্শন সপ্তকর্ম পদ্ধতির তৃতীয় ধাপ তথা ‘ফানা আনিল এরাদা’।

**ধৈর্য ও সহনশীলতা:** ধৈর্য ও সহনশীলতা মহত্বের প্রতীক। ধৈর্যের মাধ্যমেই সফলতা এবং কাঞ্চিত ফলাফল সুনিশ্চিত হয়। এজন্যই ধৈর্যের শিক্ষা দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ পাক রাকুল আলামিন পবিত্র কোরআনে। তিনি বলেন- “ওয়াসতা ইনু বিস সবরি ওয়াস সালাহ”, “ইল্লাল্লাহ মা’আস সবিরিন।” অর্থাৎ “তোমরা ধৈর্য এবং নামাযের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর”, “নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গেই রয়েছেন।”

হজুর গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারীও কঠিন বিপদে ভঙ্গদেরকে ধৈর্যধারণ করার নির্দেশ প্রদান করতেন। এমনকি ঘরে একমুঠো খাবার না থাকার সময়ও ধৈর্যধারণ করেছেন, পরম কর্মাময়ের উপর ভরসা করেছেন তিনি। এটি তাওয়াক্কুলের পর্যায়ভূক্ত।

এরই ফলাফল হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ হতে গায়েবী সাহায্য। খাঁচাভর্তি খাবার। সুবহানাল্লাহ!

উল্লেখ্য; ধৈর্য ও সহনশীলতা মাইজভাণ্ডারী সম্পর্ক পদ্ধতির চতুর্থ ধাপ তথা ‘মউতে আবইয়াজ’।

সমালোচনাকারীকে বন্ধু মনে করা: আমরা অন্যের সমালোচনা করতে যতটা পছন্দ করি ঠিক ততটাই নিজের সমালোচনাকারীকে ঘণা করি। ফলে সমালোচনাকারীর সাথে শত্রুতার সম্পর্ক গড়ে উঠে। হয় কথা কাটাকাটি। আর এ কথা কাটাকাটি অনেক সময় রূপ নেয় হাতাহাতিতে। আবার কখনো এর চেয়েও জঘন্য কিছু ঘটে যায়। কিন্তু মাইজভাণ্ডারী দর্শন সমালোচককে বন্ধুর চোখে দেখার নির্দেশ দেয়। কেননা সমালোচকের সমালোচনার কারণে নিজের দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া যায়। ফলে নিজের মাঝে বিদ্যমান দোষ-ত্রুটিগুলো সংশোধন করে নেওয়া যায়। আর যদি দোষ-ত্রুটি না থাকে তবে আল্লাহর দরবারে এর জন্য শুকরিয়া আদায় করা যায়। তাইতো মাইজভাণ্ডারী গীতিকার কবিয়াল রামেশ শীল বলেছেন-

“শুন যত বন্ধুগণ,

নিন্দুকেরে তোমরা কভু ভেবনা দুশমন।

তারা তৃরিকতের ধোপার মত ধুয়ে করুক পরিষ্কার,

নিন্দা করলে কী ক্ষতি আমার।”

উল্লেখ্য, সমালোচনাকারীকে বন্ধু মনে করা মাইজভাণ্ডারী দর্শন সম্পর্ক পদ্ধতির পঞ্চম ধাপ তথা ‘মউতে আসওয়াদ’।

কামনা-লালসা হতে বিরত থাকা: লোভ-লালসা এবং অনিয়ন্ত্রিত কামভাব যত পাপের মূল। এসবের ফাঁদে পড়ে মানুষ যাবতীয় অপকর্মে জড়িয়ে যায়। ফলে পরিবারে, সমাজে, দেশে বিশ্বালো সৃষ্টি হয়। মাইজভাণ্ডারী দর্শন অতি লোভ এবং কামভাব মুক্ত জীবন পরিচালনার নির্দেশ দেয়। হজুর গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী ভঙ্গদেরকে কাম-লালসাহীন একটি স্বচ্ছ পরিশুন্দ অন্তর নিয়ে তাঁর নিকট আসার নির্দেশ দিতেন। তিনি ভঙ্গদেরকে বলতেন - “আমার কাছে একটি পাটি বেতের বা ঘইস্যা ডাওলসের ফুলও কি নিয়া আসিতে পার নাই?” অর্থাৎ তোমরা কি একটি সুন্দর পরিচ্ছন্ন অন্তর নিয়ে আসতে পার নি? যাঁরা পরিচ্ছন্ন অন্তর নিয়ে তাঁর দরবারে এসেছেন তাঁরা সবাই সফল হয়েছেন। দুনিয়াবি লালসা তো নয়ই এমনকি স্বর্গের লালসাও তাঁদের অন্তরে ঠাঁই নিতে পারেনি। তাঁদের একমাত্র প্রত্যাশা ছিল আপন মাশুকের ভালবাসা। তেমনই একজন মাইজভাণ্ডারী দর্শনের আলোয় আলোকিত মহান ব্যক্তিত্ব আরেফ কবি আল্লামা আব্দুল হাদী কাথ্বনপুরী (র.) কাথ্বনপুরী বলেন-

“বালাখানা ভুর দলে, চাহিব না আঁধি মেলে,  
তোমার দামান তলে দাসগণের ঠিকানা।”

একই আলোয় আলোকিত বাহরুল উলুম খ্যাত গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারীর খলিফা আল্লামা আব্দুল গণী কাথ্বনপুরী বলেন - “মওলা তোরে পায় যদি, আর কি চাহি দো-জাহানে,  
তুমি বিনে আর কামনা কিছু নাহি আমার মনে।”

উল্লেখ্য; কাম-লালসামুক্ত জীবন পরিচালনা করা মাইজভাণ্ডারী দর্শন সম্পর্ক পদ্ধতির ষষ্ঠ ধাপ তথা মউতে আহমর।

নির্বিলাস জীবন-যাপন: পবিত্র কোরআনের বাণী - “ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।” অর্থাৎ “নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছি আবার তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন করব।” কী উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয়েছে তাও পবিত্র কোরআনে বিঘোষিত হয়েছে- “ওয়ামা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিয়া‘বুদুন।” অর্থাৎ আমি জিন এবং মানুষকে সৃষ্টি করেছি শুধুই আমার ইবাদত তথা পরিচয় অব্বেষু করার জন্য। অথচ আমরা তা ভুলে গিয়ে জীবনকে কীভাবে আরাম, আয়েস ও বিলাসিতায় পরিপূর্ণ করা যায়- সেই খেয়ালে মন্ত। এজন্যই মাইজভাণ্ডারী দর্শন নির্বিলাস জীবন যাপনের শিক্ষা দেয়। হজুর গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী বিলাসবহুল রেশমি কাপড় এবং স্বর্ণালঙ্কার পড়া অপছন্দ করতেন। উল্লেখ্য, নির্বিলাস জীবন যাপন করা মাইজভাণ্ডারী দর্শনের সম্পর্ক পদ্ধতির সম্মত ধাপ তথা ‘মউতে আখজার’।

মাইজভাণ্ডারী দর্শন ঐশ্বী প্রেমের শিক্ষা দেয়। ঐশ্বী প্রেমের সহজ অর্থ হল খোদা প্রেম। সৃষ্টা এবং সৃষ্টির সাথে যে সম্পর্ক তা হল প্রেমের সম্পর্ক; ভালবাসার সম্পর্ক। যে সম্পর্কের কথা আমরা পৃথিবীতে এসে ভুলে গিয়েছি, ভুলে রয়েছি সে সম্পর্কের কথা। আর তাই তা মাইজভাণ্ডারী দর্শন পুনরায় স্মরণ করিয়ে দেয় আমাদেরকে। যে পথ অনুসরণে ইহকালে ও পরকালে সর্বোন্ম কল্যাণ লাভ হয়- মানুষকে সে পথ অনুসরণ করানোই মাইজভাণ্ডারী দর্শন। এই পথ অনুসরণের মাধ্যমে অনেকে জগত বরেণ্য পরম পূজনীয় সত্ত্বায় পরিণত হয়েছেন এবং এখনো হচ্ছেন অসংখ্য ব্যক্তি। কারণ স্বয়ং খোদা তায়ালার প্রজ্জলিত নুরের ছটা অসীম।

আল্লাহ পাক রাববুল আলামিন বলেন- “আমি কোন জাতিকে ততক্ষণ পর্যন্ত পরিবর্তন করিনা, যতক্ষণ না তারা নিজেরা পরিবর্তিত হয়।” সুতরাং সংকল্প করা প্রয়োজন, আমরা প্রথমে মাইজভাণ্ডারী দর্শনের আলোকে নিজেদের জীবন গঠন করে নিজেরা নৈতিক গুণাবলি সম্পন্ন আলোকিত মানুষরূপে গড়ে উঠতে সচেষ্ট হব তৎপর নিজেদের ভেতর ধারণ করা মাইজভাণ্ডারী দর্শনের আলো দিয়ে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রকে আলোকিত করব। ইনশাআল্লাহ। আমাদের জীবন হোক কল্যাণময়, পরিবার হোক সুখময়, সমাজ হোক শান্তিময়, রাষ্ট্র হোক শৃঙ্খলাময়। পরম্পর পরকালও হোক শান্তিময়, মঙ্গলময়। আমিন। বেছরমাতে জাদিল হাসানি ওয়াল হোসাইন।

# দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ বিনির্মাণে ‘আত্মনির্ভরশীলতার তাৎপর্য’

## ● মোহাম্মদ মিনহাজ উদ্দিন ●

‘বড় হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে’- ঠিক এই বাক্যটা ছোট বেলায় বাবা-মা, মুরুবিগণসহ সবাই বারংবার বলতেন। এটা শুনে জীবনের একটা বয়সে এসে ভাবতাম- “আমি তো সেই দেড় বছর বয়সেই রীতিমত দৌড়াতে শিখে গিয়েছি। তাহলে এখন যে বলা হচ্ছে, ‘বড় হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে’- এটা আবার কেমন দাঁড়ানো?” বয়সের গতিপথে বুঝে আসল, এটা একটা রূপকার্থক কথা ছিল। এর একটা বিশেষ তাৎপর্যবহু মানে আছে। আর তা হল, ‘আত্মবিশ্বাসী হয়ে নিজের সক্ষমতাকে যথাযথভাবে কাজে লাগানো ও অপরের সাহায্যের অযুহাতে নিজের সক্ষমতাকে অকার্যকর করে না দেওয়া।’ আরেকটু সবিস্তারে বলতে গেলে- কোন কাজ সম্পাদনের জন্যে পারিপার্শ্বিক চাহিদা অনুযায়ী সুগঠিত সক্ষমতা অর্জন করা। ‘অকর্মণ্যতা’কে বিদায় জানানো। পরের উপর নির্ভরশীল না হওয়া। এই পুরো ব্যাপারটা হলো এক শব্দে- ‘আত্মনির্ভরশীলতা’।

ছোটবেলায় আমরা কবি ‘রঞ্জনীকান্ত সেন’ এর একটি কবিতা পড়েছিলাম। কবিতার নাম- ‘স্বাধীনতার সুখ’। কবিতার সারাংশ হলো- ‘দুই পাখির মধ্যকার সংলাপধর্মী দুটো কথা। যেখানে চড়ুইপাখি পরের নির্মিত অট্টালিকায় বসবাস করে এবং বাবুইপাখিকেও সেখানে বসবাস করতে উৎসাহ দেয়। কিন্তু বাবুইপাখি নিজের সক্ষমতা-সামর্থ্যে নির্মিত খড়-কুটোর বাসায় অনাবিল সুখ খুঁজে পায়।’

‘বেগম রোকেয়া’র ‘চাষার দুক্ষ’ প্রবন্ধটি আমরা একটু স্মরণ করতে চাই। প্রবন্ধটির মূলভাষ্য হল, “ভারতবর্ষে একসময় দরিদ্র “গোষ্ঠী তথা কৃষকের ঘরে ‘মরাই ভরা ধান ছিল’, ‘গোয়াল ভরা গরু ছিল’, ‘উঠোন ভরা মুরগী ছিল’ ইত্যাদি। কিন্তু পরবর্তীতে তাঁদের এমন অবস্থা হয় যে, টাকায় ২৫/২৬ কেজি চাল পাওয়া সত্ত্বেও ভাত না পেয়ে তাঁদের লাউ, কুমড়া, পাটশাক, লাউশাক প্রভৃতি সিদ্ধ করে খেতে হত! এরূপ বিপরীত পরিস্থিতি কি অকারণেই তৈরি হয়েছিল? -না অকারণে নয়! এর সুবিস্তৃত কারণ রয়েছে। যা প্রবন্ধটিতেই বিখ্যুত হয়েছে। যার প্রথমটি হল, ‘বিলাসিতা’ এবং অপরটি হল, ‘অনুকরণপ্রিয়তা’। একটু গভীরে চিন্তা করলে দেখা যায়, এদুটো কারণের উপর একটি ‘মৌলিক কারণ’ রয়েছে- ‘আত্মনির্ভরশীলতাহাস’। বোধগম্যতার সুবিধার্থে অপর কারণ

দুটোকে মৌলিক কারণটির ‘উপ-কারণ’ হিসেবে চিহ্নিত করছি।

এবার কলমকে একটু বিস্তারিতভাবে তুলে ধরতে হয়- একসময় ভারতবর্ষে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মেয়েরাও কুটির শিল্পে খুবই যত্নবান ছিল। তারা চরকার মাধ্যমে নিজ হাতে রেশমের সুতা কেটে বাড়িসুন্দ সবার জন্যে কাপড় তৈরি করত। এ রেশমি সুতা তারা কাটত রেশমি পোকা নামে এক প্রকার পোকা থেকে। এমনকি এ পোকার চাষ করত তারা। আসাম ও রংপুর জেলায় এ প্রকার রেশম হত। যাকে স্থানীয় ভাষায় ‘এন্ডি’ বলা হত। উল্লেখ্য, তারা এ প্রকার সুতা শুধু বাড়িতেই কাটত তা নয়, বরং কোথাও বেড়াতে গেলে যাতায়াতের সময় তাদের হাত চলত বরাবরই। অধিকন্তু তারা এ কাজ করত অনেকটা হেসে-খেলেই। যার দরুণ তখন চাষা পরিবার অন্নবস্ত্রের কাঙাল ছিলনা।

কিন্তু যেইমাত্র তারা আধুনিকতার ছোঁয়া পেতে লাগল, সাথে সাথে এ কাজ তারা দূরে ঠেলে দিল। কারণ যেখানে সুলভ মূল্যে রঙিন কাপড় পাওয়া যাচ্ছে সেখানে এই কুটির শিল্পের এত যত্ন-আন্তি করবে কে? তারা বিলাসিতায় গা ভাসিয়ে দিল। কাপড় কাচার জন্যে যে ক্ষার তৈরি হত, তাও আর হয়না। ধোপার আবির্ভাব হয়েছে; সোডার আবিষ্কার হয়েছে- সুতরাং এত ঝামেলায় আর যায় কে? যে পথ মিনিট কয়েকের খরচায় পায়ে হেঁটে পাড়ি দেওয়া যেত সেখানে তো আজ মোটরযান চলে এসেছে। তাহলে পায়ে চলার আর দরকার কী! -মোটরযানই হোক নিত্যসঙ্গী। তবে খরচা? -সে আর এমন কী! দু আনা মাত্র। কিন্তু যেতে দু আনা আবার আসতে দু আনা, মোট চার আনা যে খরচ হয়ে গেল- সে হিসেব আর কে রাখে? আর এভাবেই ধীরে ধীরে বিলাসিতায় আচ্ছন্ন করে ফেলল এ জাতিকে। সাথে আরেকটা বড় রোগ তাঁদের মনে বাসা বাঁধল- এ যে ‘অনুকরণপ্রিয়তা’! ‘প্রতিবেশীর যেটা আছে, আমারও সেটা থাকা চাই’- এই মানসিকতা যেইমাত্র জেঁকে বসল, অমনিই তাঁদের বিলাসিতার মাত্রা বেড়ে গেল বহুগুণ। কিন্তু সামর্থ্যের দিকটা আর যাচাই করে দেখা হলনা। অসদুপায়ী সন্তান বাবাকে কারণ দর্শিয়ে নির্দিষ্ট অংকের টাকার চাপ দিল, সে একটাবার ভাববার প্রয়োজন বোধ করল না যে- ‘তার বাবার এ সামর্থ্য আছে কিনা?’

আর যখনই এ জাতি বিলাসিতা ও অনুকরণপ্রিয়তায় ডুবে গিয়ে নিজের কাজ করার ক্ষমতা বা সক্ষমতা ভুলে গেল তৎপরই পরনির্ভরশীল হয়ে গেল আপনাআপনিই। বিদায় নিল আত্মনির্ভরশীলতা। টাকা দেই- অন্ন মেলে; টাকা দেই- বস্ত্র মেলে। কিন্তু এই অন্নবস্ত্র যদি নিজেদের সক্ষমতা বা মাধ্যমেই উৎপাদিত হত, তাহলে সাশ্রয়ের হিসেবটা যে কত বড় হত এবং দারিদ্র্য মুক্তিতে যে এটা কতটা কার্যকরী ভূমিকা রাখত-সে হিসেবরক্ষক আজ আর নেই! আর ক্রমান্বয়ে এভাবেই আমরা আত্মনির্ভরশীলতা হারিয়ে দারিদ্র্যকে আলিঙ্গন করেছি পরোক্ষ স্বেচ্ছাচারিতায়।

বর্তমান সময় মহামারীকালীন সময়। করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) চলমান। কিছুদিন আগে এর প্রভাব কতটা ভয়াবহ ছিল- তা বর্ণনাতীত। পরিস্থিতি এতটাই প্রতিকূল ছিল যে, এলাকাভিত্তিক (জেলা/উপজেলা) লকডাউন (Lockdown) জারি করতে হয়েছিল। এমনকি আইনি দৃঢ় পদক্ষেপে তা বাস্তবায়নের চেষ্টা করা হয়েছিল। এক এলাকার জনগণ অন্য এলাকায় প্রবেশ করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এই পরিস্থিতিতে টিকে থাকার জন্যে নিজ এলাকায় ‘অন্ন-বস্ত্র-চিকিৎসার যথাযথ ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক’। এখানে এলাকাটিকে যখন একটি ‘গোষ্ঠিসভা’ হিসেবে বিবেচনা করা হবে, তখন বলতে হবে ‘আত্মনির্ভরশীলতা আবশ্যক’। অর্থাৎ নিজ এলাকার সমষ্টিগত সক্ষমতা বা সামর্থ্যকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের উপর নিজেরা নির্ভরশীল হওয়া। সুতরাং দ্বিহাইন চিন্তে একথা কি বলতে পারি- এই মহামারী নিল তো নিল; অনেক কিছুই নিল। তবে কিছু দিলও বটে। যার মধ্যে অন্যতম হল ‘আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের শিক্ষা’?

এ আলোকপাত ছিল ‘বাস্তবতা’র আলোকে। ‘আত্মনির্ভরশীলতা’ সম্পর্কে ‘শরিয়তে মোহাম্মদী’র দৃষ্টিভঙ্গি ও অবস্থান কী? আল্লাহর হাবিব (দ.) এর সর্বজন বিদিত ও প্রসিদ্ধ একটি ঘটনা হল, একদা এক ভিক্ষুক এসে আল্লাহর হাবিব (দরুণ)’র নিকট ভিক্ষা চাইলে তিনি ভিক্ষুককে জিজেস করলেন, তাঁর বাড়িতে কী আছে? ভিক্ষুক উত্তর করলেন, একটা কম্বল আছে। তিনি ভিক্ষুককে সেটা নিয়ে আসতে বললে ভিক্ষুক তাই করলেন। অতঃপর তিনি সেটা বিক্রি করে দিয়ে এর লক্ষ অর্থ থেকে কিছু অংশ দিয়ে একটি কুঠার কিনলেন। তৎপর তাতে নিজ হাত মোবারকে হাতল লাগিয়ে ভিক্ষুককে দিয়ে বনে গিয়ে কাঠ সংগ্রহ করে তা বিক্রি করত তা দিয়ে পরিবার-পরিজনের ভরনপোষণ চালাতে বললেন। বাকি অর্থ দিয়ে আপাতত পরিবারের জন্যে কিছু খাবার নিয়ে যেতে

বললেন। ভিক্ষুক তাই করলেন। আল্লাহর হাবিব (দ.) প্রথমদিনই লোকটিকে কিছু অর্থ দিয়ে বিদায় দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা না করে ভিক্ষুককে দেখিয়ে দিলেন ‘আত্মনির্ভরশীলতা’র পথ।

একটা চীনা প্রবাদ আছে, “কাউকে মাছ শিকার করে খাওয়ানোর চেয়ে মাছ শিকার করার পদ্ধতি শিখিয়ে দেওয়া উত্তম।”

সম্মানিত পাঠক, ‘বাস্তব প্রেক্ষাপট’, ‘ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট’ ও ‘শরিয়তে মোহাম্মদী’র সুস্পষ্ট অবস্থানকে সামনে রেখে বিবেচনা করতঃ এবিষয়টি প্রতীয়মান যে, উপর্যুক্ত তিনটি ক্ষেত্রেই ‘আত্মনির্ভরশীলতা’ কতটা প্রয়োজনীয়তা ও গ্রহণযোগ্যতার দাবিদার তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এমনকি আমরা এটাও দেখতে পাই যে, মহান রাব্বুল আলামিন প্রদত্ত ইসলামের শাশ্বত ধারা ‘ত্বরিকা’র মধ্যে বাংলাদেশে প্রবর্তিত একমাত্র ত্বরিকা ‘মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকা’ও এই ‘আত্মনির্ভরশীলতা’কে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে স্থান দিয়েছে। এই ত্বরিকার দর্শনে সাতটি ধাপ বা পদ্ধতি রয়েছে। যার মধ্যকার প্রথমটিই হল, ‘আত্মনির্ভরশীলতা’। এর সুফিতাত্ত্বিক পরিভাষা হল, ‘ফানা আনিল্ খালক’ এবং এই ত্বরিকার দর্শন সম্পর্ক পদ্ধতিটির আরবি পরিভাষা হল, ‘উসুলে সাবআ’। যা এই ত্বরিকার প্রবর্তক ও অদ্বিতীয় প্রাণপূরুষ, আউলাদে রাসূল (দ.), গাউসুল আয়ম হ্যরত মাওলানা শাহসুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (ক.) প্রবর্তন করেন।

## দৃষ্টি আকর্ষণ

মাসিক আলোকধারা’র সম্মানিত পাঠকগণ

এখন থেকে ‘পাঠক পর্যবেক্ষণ’ কলামে আপনাদের সুচিত্তি মতামত পাঠাতে পারবেন। এতে সমকালীন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানবিক-সামাজিক সমস্যা ও যৌক্তিক সমাধানপূর্ণ মতামতকে স্বাগত জানানো হবে। লেখা সম্পাদকীয় দণ্ডে

e-mail:  
sufialokdhara@gmail.com -এ  
পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

## পাঠক মতামত

# উত্তীর্ণ সমাজ বিনির্মাণে সুফিবাদের ভূমিকা

## মুহাম্মদ সৌরভ হোসেন

সুফি শব্দটির অর্থ সুতো বা পশম। প্রাথমিক যুগের সুফিবৃন্দ দুনিয়া থেকে নিজেদের অসম্পৃক্ততা প্রকাশের জন্য এবং বস্তুবাদকে প্রত্যাখানের জন্য পশমের জামা কাপড় পরতেন। কেউ কেউ বলেন, ‘সাফা’ যার অর্থ পরিশুন্দি; ‘সাফউইয়া’ যার মানে মনোনীত জন: সুফ্ফা যার মানে কোন নিচু বারান্দাকে বুঝায়। রাসূলে পাক (দ.) এর যামানায় কিছু সাহাবী (রা.) নিজেদেরকে দুনিয়াবী কর্মকাণ্ড থেকে দূরে রেখে কৃচ্ছ্রতাপূর্ণ জীবনযাপন করতে থাকেন। তাঁরা ‘আসহাবে সুফ্ফা’ নামে পরিচিত। মসজিদে নববী শরিফের সম্মুখস্থান বারান্দায় আহলে সুফ্ফাগণ দুনিয়া ত্যাগী অবস্থায় সর্বদা ইবাদত-বন্দেগী ও মোরাকাবা-মোশাহেদায় ঘষণ্টল থাকতেন। (গ্রন্থসূত্র: তাসাউফ সমগ্র, অনুবাদ ও সংকলন-কাজী সাইফুল্লাহ হোসেন) আত্মা সম্পর্কিত আলোচনাই সুফিবাদের মুখ্য বিষয়। আত্মার পরিশুন্দির মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার সাথে সম্পর্ক স্থাপনই হলো এ দর্শনের মর্মকথা। পরম সন্তা মহান আল্লাহ তায়ালাকে জানার এবং চিনার আকাঙ্ক্ষা মানুষের চিরস্তন। স্তুষ্টা এবং সৃষ্টির মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ক আধ্যাত্মিক জ্ঞান এবং জ্ঞানের মাধ্যমে জানার প্রচেষ্টাকে সুফিবাদ বা সুফিদর্শন বলে। সুফিবাদ, ইসলাম ধর্মস্থিত কোন দল বা উপদল নয় বরং ইসলামের নিগৃহ রহস্যবলির সমন্বয়ে গঠিত একটি ধারা। সুফিবাদ সম্পর্কে ইমাম আবু হানিফা (রা.) বলেন, “আমি যদি সৈয়দেনো জাফর সাদেক (রা.) এর সাথে দু’বছর না কাটাতাম, তাহলে আমি আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সাগরে অবগাহন করতে সক্ষম হতাম না।” ( দোররূল মুখ্যতার, ১ম খণ্ড, পৃ.-৪৩)

হজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাজালী (রা.) বলেন, “আমি নিশ্চিতভাবে জেনেছি যে, সুফিরা হচ্ছেন আল্লাহর পথের সন্ধানী, তাঁদের আচরণ হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট আচরণ, তাঁদের পথ হচ্ছে সর্বোত্তম পথ এবং তাঁদের ব্যবহার হচ্ছে সবচেয়ে পবিত্র। তাঁদের অন্তরে আল্লাহ ছাড়া আর কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই; তাঁরা হচ্ছেন আধ্যাত্মিক জ্ঞান-নদীর স্রোতধারা।” (Al Munqidh পৃ.১৩১)

ইসলাম ধর্মে সকল প্রকার সন্তাস, জঙ্গীবাদ ও উত্তপ্ত্বা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। পবিত্র কোরআনে ইসলাম ধর্মকে ‘সহজপন্থা’ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। ইসলাম ধর্ম প্রচারকালে মুক্ত স্বীয় গোত্রের আত্মীয়-স্বজন কর্তৃক নানাভাবে নিপীড়িত হয়েও রাসূলে পাক (দ.) কখনো উগ্র আচরণ করেননি। কুরাইশ সহ প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ইসলামের সকল জিহাদ ছিল সম্মুখ যুদ্ধ।

রক্তপাতহীনভাবে মুক্ত বিজয় করে পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। এ সম্পর্কে বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব মহাত্মা গান্ধী খুব সুন্দর বলেছেন। তিনি বলেন, “আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, সে যুগের ইসলাম জীবন ধারায় যে স্থান লাভ করেছিল তা তরবারীর বলে নয়। এটা ছিল পয়গম্বর মুহাম্মদ (দ.) এর কঠোর সরলতা, সম্পূর্ণ আত্মা বিলোপ, অঙ্গীকার পালনে একান্ত যত্নশীলতা। তাঁর বন্ধু ও অনুবর্তীগণের প্রতি একান্ত বিশ্বাস। জগত বিখ্যাত দার্শনিক কবি টেলস্ট্য বলেছেন, “আমি হ্যরত মুহাম্মদ (দ.) থেকে অনেক কিছু শিখেছি। তাঁর আগে দুনিয়া ভাস্তির আঁধারে আচ্ছাদিত ছিল। তিনি আলো হয়ে জলে উঠেছিলেন, আমি বিশ্বাস করতে বাধ্য যে, মুহাম্মদ (দ.) এর প্রচার ও হিদায়ত যথার্থ ছিল।”

সুফিয়ায়ে কিরাম তাদের অন্তরণ তাওহীদ এবং মারফতের নূর দ্বারা পবিত্র করেছেন। সুফিবাদের মূল মন্ত্রণই হলো আত্মার পরিশুন্দি। রাসূলে পাক (দ.) দুনিয়া থেকে পর্দা করার পর আসহাবে রাসূলগণ (রা.) চরিত্রে-কাজের মধ্যে সুফিবাদের ধারা লক্ষণীয়। এরপর তাবেঙ্গন, তাবে-তাবেঙ্গন, আইম্মায়ে মুয়তাহিদিন ও আউলিয়ায়ে কিরামের কর্মধারায়ও আমরা তা দেখতে পাই। বিশেষ করে ইমাম জয়নুল আবেদীন (রা.) এর পর থেকে আমরা সুফিবাদের ব্যাপক প্রচার-প্রসার দেখতে পাই।

সুফিগণ মানুষকে ডেকেছেন সত্ত্বের পথে, অবারিত কল্যাণের পথে। শিক্ষা দিয়েছেন, সম্প্রীতি, সৌহার্দ্যবোধ, সহমর্মিতা ও সহাবস্থানের। কোন রকম যুদ্ধ-বিহু নয় বরং মানুষের মন জয় করার মধ্য দিয়ে তাঁরা মানুষের মনের রাজাধিরাজ হয়েছেন। তাই কথা আছে, “না তলোয়ার, না তীর সব কি দিলকি আমীর।” হ্যরত হাসান বসরী (র.), হ্যরত ওয়ায়েস করোনী (র.), হ্যরত জুনায়েদ বোগদানী (র.), গাউসুল আয়ম দস্তগীর সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানী (ক.) হ্যরত খাজাগরীবে নেওয়াজ (র.) হ্যরত গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডী (ক.) হ্যরত বাবা ভাণ্ডী (ক.), শাহানশাহ হ্যরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডী (ক.), মনসুরে হাল্লাজ (র.) সুলতান বায়েজিদ বোস্তামী (র.), হ্যরত শাহজালাল ইয়ামেনী (র.), পীর কেল্লা শহীদ (র.) চট্টগ্রামের বার আউলিয়াসহ অনেক আউলিয়ায়ে কিরাম সবাই সুফিবাদের চর্চার মাধ্যমে মানুষকে ইসলামের সুশীতল ছায়ার পানে আহ্বান জানান। হ্যরত গাউসুল আয়ম শেখ সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানী (ক.)

৪৭১ হিয়রীর ১ রময়ান মোতাবেক কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণ জিলান জেলার নাফ নামক গ্রামে ধর্ম সংস্কারক রূপে বেলায়তে ওজমান অধিকারী হয়ে প্রথম গাউসুল আয়ম ও কুতুবুল আকতাবরূপে এই ধরাধামে আসেন। গাউসিয়তের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে তিনি সকলকে শান্তির পথে ডেকেছেন। ওনারই সোহবতে এসে শত শত অঙ্ককার পথের যাত্রীগণ পেয়েছেন আলোর বার্তা। ভারতবর্ষে সুফিবাদ প্রচার করেছেন খাজা গরীবে নেওয়াজ (র.)। যিনি ৯০ লক্ষ মানুষকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেছেন। হিন্দুস্থানের জমিনে স্থীয় আধ্যাত্মিক ক্ষমতা ও মোহনীয় চারিত্রিক মাধুর্যতায় জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের মনে ঠাঁই করে নিয়েছেন। তাই ওনার রওজা শরিফে যিয়ারত করতে ভিড় জমে নানা ধর্ম-বর্ণের লোকের।

ভারতের বৃটিশ সরকারের সু-প্রসিদ্ধ গভর্নর জেনারেল লর্ড কার্জনও তাঁর শাসনামলে খাজা গরীবে নেওয়াজ (র.) এর মায়ার শরিফ জিয়ারত করতে যান। ভারত হতে লওনে প্রত্যাবর্তনের পর লর্ড কার্জন এক সময় কমপ্ল সভায় বলেছেন যে, “ভারতে একটি কবর দেখে আসলাম, তা ভারতের বুকে একটি শাহী দরবার খুলে বসেছে, কবরটি হ্যরত খাজা মঙ্গনুদীন চিশ্তীর যা সমগ্র ভারত বর্ষের শাসন কার্যাবলীর নিয়ন্ত্রক বলে আমার বিশ্বাস।” (সূত্র: তাজকেরায়ে খাজা মঙ্গনুদীন চিশ্তি, শাহ আহমদ নবী গরিবী, পৃষ্ঠা-২১২)

গাউসুল আয়ম হ্যরত মাওলানা শাহসুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাওরী (ক.) ১২৩৩ বাংলা ১ মাঘ বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি থানার অন্তর্গত মাইজভাওর নামক গ্রামে বেলায়তে ওজমার অধিকারী হয়ে বেলায়তে মোত্লাকায়ে আহমদীর সূচনাকারী হিসেবে তাশ্রীফ আনেন। বেলায়তে মোত্লাকা হল বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন বাঁধাইন বিকাশ ও সর্ববেষ্টনকারী বেলায়তী শক্তি। এটা বিভিন্ন মতবাদকে নীতিগতভাবে একই দৃষ্টিতে দেখে। তাই তিনি কালাম করেছেন, “যে কেউ আমার সাহায্য চাইবে, আমি তাকে উন্মুক্ত সাহায্য করব।” কলিকাতা নিবাসী মওলানা জুলফিকার আলী সাহেব যিনি চট্টগ্রাম মোহসেনীয়া মাদ্রাসার ভূতপূর্ব সুপারিনেটেন্ডেন্ট ছিলেন। তিনি লিখেছেন, “গাউসে মাইজভাওরের নিঃশ্বাসের বরকতে পূর্বদেশবাসীরা আল্লাহহ্যাতী ও সাহেবে হাল জজবার অধিকারী হন, অর্থাৎ দেহ ও প্রাণের সাথে খোদা-প্রেম পরিব্যাপ্ত মানব প্রকৃতি জজবহাল অবস্থা প্রাপ্ত হন। তাঁর মায়ারে পাকের বরকতে যে তাসির, মাটিস্থ বুরুগানের এই দেশীয় কবরের মধ্যে জালালী বা রওনক এনে দিয়েছে।” (সূত্র: বেলায়তে মোত্লাকা, পৃ.৪১)

কিন্তু সুফিবাদী মহান মনীষীগণ আজও মানুষকে সত্যের দিশা

দিয়ে যাচ্ছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত দিয়ে যাবেন। সুফিয়ায়ে কিরামের দরবার সমূহে এখনো সকল শ্রেণি, পেশার মানুষ শান্তির আভাস খোঁজে পায়। সুফি কবি আল্লামা বজলুর করিম মন্দাকিনী বলেন, “যুগে যুগে তুমি বিভিন্ন প্রদেশে, নবী-অলি নামে মুনি ঝৰি বেশে, ঘোর অঙ্ককার হতে তুমি মানবীকে আলোতে টানিয়ে আন।” তাই আসুন আমরা সকলে মিলে সুফিবাদের যুগোপযোগী সংস্কার তথা বাংলাদেশে উদ্ভোদিত একমাত্র তুরিকা “তুরিকায়ে মাইজভাওরীয়া” তে নিজেকে সম্পৃক্ত করে একটি সুখী-সমৃদ্ধ জাতি গঠনের আদর্শিক আন্দোলনে শরিক হই।

## সুফি উদ্ধৃতি

- আল্লাহর জমিনে ভ্রমণ কর। কেননা, পানি যতদিন প্রবাহিত হতে থাকে পরিষ্কার থাকে। আবদ্ধ হয়ে পড়লে তা নষ্ট হয়ে যায় এবং রংও পরিবর্তন হয়ে যায়।
- সন্দেহজনক বিষয় ও কাজ হতে নিজেকে পরিষ্কার রাখা এবং প্রতি মুহূর্তে নিজের কাজের হিসাব রাখাই প্রকৃত পরাহেজগারী।
- আ'রিফ অর্থাৎ আল্লাহর তত্ত্বজ্ঞানীরাই আল্লাহতা'য়ালার খাস বা বিশিষ্ট লোক। আর সুফি সেই ব্যক্তি যিনি আল্লাহতা'য়ালার ব্যাপারে মন পরিষ্কার রাখেন।
- তিনিই প্রকৃত আ'রিফ বা আল্লাহর তত্ত্বজ্ঞানী যাকে আল্লাহতা'য়ালা ভিন্ন অন্য কেউ চিনে না। আর আল্লাহ তা'য়ালাকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে ভিন্ন কেউ তাঁকে সম্মান করে না।
- তুমি ততক্ষণ কামেল হতে পারবে না, যতক্ষণ তোমার শক্তি তোমার থেকে নির্ভয় ও নিরাপদ না হয়।
- কথা বললে যদি তোমার কথার মধ্যে অহংকার ও গর্বের ভাব প্রকাশ পায়, তবে বলিও না, নিরব থাক। আর যদি নিরব থাকার মধ্যে কিছু আত্মর্যাদা বোধের খেয়াল হয়, তবে কথা বল। মোটকথা এমন কাজ কর যাতে অহংকার ও আত্মর্যাদাবোধ উভয়ই দূরীভূত হয়।

- হ্যরত বিশর ইবন হারেস হাফী (রহ.)

## একনজরে

### শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) ট্রাস্ট-এর সাম্প্রতিক মানবিক কর্মসূচি



**বিশ্বালি শাহানশাহ হযরত মাওলানা শাহ সুফি সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.)-এর ৩২তম মহান ২৬ আশ্বিন উরস শরিফ উপলক্ষে ‘এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট’-এর উদ্যোগে দেশের বিভিন্ন জেলায় করোনার প্রাদুর্ভাবে দীর্ঘদিন ধরে অর্থনৈতিকভাবে পর্যুদ্ধ সহস্রাধিক পরিবারকে ‘দুর্যোগ প্রশমন প্রকল্প’র আওতায় আর্থিক সহায়তা প্রদান কর্মসূচি**



**‘মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি বাংলাদেশ’ নিয়ন্ত্রণাধীন শাখা কমিটি সমূহের ব্যবস্থাপনায় সাম্প্রতিক মহামারী চলাকালীন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সাময়িক সমস্যাক্রিষ্ট পরিবারের মাঝে চলমান সহায়তা প্রদান কর্মসূচি**



**‘এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট’-এর ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম কর্মশালা সম্পাদনপূর্বক মহামারী চলাকালীন বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করা ব্যক্তিদের গোসল, কাফন, জানায়া ও দাফন কর্মসূচি।**



**‘এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট’ নিয়ন্ত্রণাধীন ‘দারিদ্র বিমোচন প্রকল্প’ (যাকাত তহবিল)-এর মহামারীকালীন চিকিৎসাসেবা কার্যক্রম**



# শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কং) ট্রাস্ট-এর নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত বহুমাত্রিক কল্যাণমুখী প্রতিষ্ঠানসমূহ

## শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

০১. মাদ্রাসা-ই-গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী,  
মাইজভাণ্ডার শরিফ, চট্টগ্রাম।
০২. উম্মুল আশেকীন মুনওয়ারা বেগম এতিমখানা ও  
হিফ্যখানা, মাইজভাণ্ডার শরিফ, চট্টগ্রাম।
০৩. গাউসিয়া হক ভাণ্ডারী ইসলামিক ইন্সিটিউট (দাখিল),  
পশ্চিম গোমদঙ্গী ১৩নং ওয়ার্ড, বোয়ালখালী, পৌরসভা, চট্টগ্রাম।
০৪. গাউসিয়া কলন্দরীয়া নঙ্গীয়া মাদ্রাসা হেফজখানা ও  
এতিমখানা,  
বেতছড়ি ১নং ওয়ার্ড, ১৩নং ইসলামপুর, ঠাণ্ডাছড়ি, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম।
০৫. শাহানশাহ হক ভাণ্ডারী সুন্নিয়া দাখিল মাদ্রাসা  
গোরখানা, মানিকছড়ি, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।
০৬. শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কং) স্কুল,  
শাস্তিরদীপ, গাহিরা, রাউজান, চট্টগ্রাম।
০৭. মাদ্রাসা-ই-শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক  
মাইজভাণ্ডারী হিফ্যখানা ও এতিমখানা,  
হামজারবাগ, বিবিরহাট, চট্টগ্রাম।
০৮. শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী  
(কং) ইসলামি একাডেমি, হাইদগাঁও, পটিয়া, চট্টগ্রাম।
০৯. শাহানশাহ হক ভাণ্ডারী ইবতেদায়ী ও ফোরকানিয়া মাদ্রাসা,  
সুয়াবিল, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।
১০. বিশ্বালি শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক  
মাইজভাণ্ডারী (কং) হাফেজিয়া সুন্নিয়া মাদ্রাসা,  
হাটপুরুরিয়া, বটতলী বাজার, বরুড়া, কুমিল্লা।
১১. মাদ্রাসা শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক  
মাইজভাণ্ডারী (কং) ফোরকানিয়া মাদ্রাসা, মনোহরদী, নরসিংদী।
১২. জিয়াউল কুরআন নূরানী একাডেমি, পূর্ব লালানগর, ছেট  
দারোগার হাট, সীতাকুড়, চট্টগ্রাম।
১৩. মাদ্রাসা-ই-শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক  
মাইজভাণ্ডারী, সৈয়দ কোম্পানী সড়ক, ফরহাদাবাদ, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
১৪. মাদ্রাসা-ই জিয়া মওলা হক ভাণ্ডারী,  
পশ্চিম ধলই (রেল-লাইন সংলগ্ন), হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
১৫. শাহানশাহ হক ভাণ্ডারী ফোরকানিয়া মাদ্রাসা,  
পাটিয়ালছড়ি, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।
১৬. মাদ্রাসা-ই-শাহানশাহ হক ভাণ্ডারী, বৈদ্যেরহাট, ভুজপুর, চট্টগ্রাম।
১৭. শাহানশাহ হক ভাণ্ডারী ফোরকানিয়া মাদ্রাসা,  
ফতেপুর, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
১৮. মাদ্রাসা-ই-শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক  
মাইজভাণ্ডারী, খিতাপচর, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।
১৯. জিয়াউল কুরআন জামে মসজিদ ও ফোরকানিয়া  
মাদ্রাসা, চরখিজিরপুর (ট্যাক্সির), বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।
২০. শাহানশাহ হক ভাণ্ডারী ফোরকানিয়া মাদ্রাসা,  
মেহেরআটি, পটিয়া, চট্টগ্রাম।
২১. জিয়াউল কুরআন সুন্নিয়া ফোরকানিয়া মাদ্রাসা,  
এয়াকুবদঙ্গী, পটিয়া, চট্টগ্রাম।

২২. শাহানশাহ হক ভাণ্ডারী ফোরকানিয়া মাদ্রাসা,  
চন্দনাইশ (সদর), চট্টগ্রাম।

২৩. হক ভাণ্ডারী নূরানী মাদ্রাসা, নূর আলী মিয়ার হাট,  
ফরহাদাবাদ, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

২৪. শাহানশাহ হক ভাণ্ডারী দায়রা শরিফ ফোরকানিয়া  
মাদ্রাসা, চরখিজিরপুর, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।

২৫. শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কং)  
ফোরকানিয়া মাদ্রাসা, পশ্চিম ধলই (রেললাইন সংলগ্ন),  
হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

২৬. বাইত-উল-আসফিয়া, মাইজভাণ্ডারী খানকাহ শরিফ,  
খাদেম বাড়ি (৩য় তলা), বাড়ি # ৪, ব্লক # ক, মিরপুর হাউজিং  
এস্টেট, উত্তর বিশিল, থানা-শাহ আলী, মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬।

## শিক্ষাবৃত্তি প্রকল্প:

- শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কং) বৃত্তি তহবিল  
“সুবিধাবধিত জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবা প্রকল্প”:
- হোসাইনী দাতব্য চিকিৎসালয় ও খত্না সেন্টার  
মাইজভাণ্ডার শরিফ, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম
- সৈয়দ নূরুল বখতেয়ার শাহ (রং) দাতব্য চিকিৎসালয়  
গাউসিয়া হক ভাণ্ডারী খানকাহ শরিফ, বিবিরহাট, চট্টগ্রাম
- জামাল আহমদ সিকদার দাতব্য চিকিৎসালয়  
স্টীলমিল বাজার, পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম
- হযরত আকবর শাহ (রং) দাতব্য চিকিৎসালয়  
ইস্পাহানী ‘সি’ গেইট, আকবর শাহ, চট্টগ্রাম
- সৈয়দ ছালেকুর রহমান শাহ (রং) দাতব্য চিকিৎসালয়  
ধামাইরহাট, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম
- শাহানশাহ হক ভাণ্ডারী (কং) দাতব্য চিকিৎসালয়  
আজিমপুর, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম
- সৈয়দ আবদুল গণি কাঞ্চনপুরী (রং) দাতব্য চিকিৎসালয়  
মানিকপুর, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম

## দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থিক সহায়তা প্রকল্প:

- যাকাত তহবিল
- দুষ্ট সাহায্য তহবিল
- মাইজভাণ্ডারী আদর্শগত গবেষণা ও প্রকাশনা প্রকল্প:

## মহিলাদের আত্মজিজ্ঞাসা ও জ্ঞানানুশীলনমূলক সংগঠন:

- আলোর পথে
- দি মেসেজ

## সংগীত ও সংস্কৃতি চর্চা প্রকল্প:

- মাইজভাণ্ডারী মরমী গোষ্ঠী
- মাইজভাণ্ডারী সংগীত নিকেতন

## জনসেবা প্রকল্প:

- দৃষ্টিনন্দন যাত্রীছাউনী, মুরাদপুর মোড়, চট্টগ্রাম।
- দৃষ্টিনন্দন যাত্রীছাউনী ও ইবাদতখানা, নাজিরহাট তেমোহনী রাস্তার মাথা।
- দৃষ্টিনন্দন যাত্রীছাউনী, শান-ই-আহ্মদিয়া গেইট সংলগ্ন, মাইজভাণ্ডার শরিফ।

## বার্ষিক অনুষ্ঠানসমূহে

- ন্যায্যমূল্যের হোটেল (মাইজভাণ্ডার শরিফ),  
আম্যমাণ ওযুখানা ও টয়লেট।